وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)
কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ছিয়াম রেখে মিথ্যা কথা, কাজ এবং মূর্খতা পরিত্যাগ করতে পারল না, তার ছিয়াম রেখে শুধু পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬০৫৭)।

● ৯ম বর্ষ ● ৫ম সংখ্যা ● মার্চ ২০২৫
Web : www.al-itisam.com

সম্পাদকীয়

রামাযান: ভালো অভ্যাস গঠনের অনন্য সুযোগ

MONTHLY AL-ITISAM

Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**

Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**

Printed By : Al-Itisam printing press

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210

Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840

E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٩، شعبان و رمضان و شوال ١٤٤٦هـ/ مارس ٢٠٢٥م العدد: ٥، الجزء: ١٠١
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বরসমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য
মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ | নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহমুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২

মাসিক আল-ইতিছাম-এর বর্ষভিত্তিক বোর্ড বাইন্ডিং সংগ্রহ করুন

প্রতি বর্ষ
বোর্ড বাইন্ডিং-এর মূল্য
৪৬০ টাকা

বোর্ড বাইন্ডিং পেতে যোগাযোগ করুন
০১৭৫০-১২৪৪৯০ ☎ ০১৪০৭-০২১৮৪০

alitisam2016 | al-itisam.com

৯ম বর্ষ
৫ম সংখ্যা

মার্চ ২০২৫
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩১
শা'বান-রামাযান ১৪৪৬

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
◆ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
◆ মো: নাসির উদ্দিন ◆ আল আমিন
◆ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সার্কুলেশন ম্যানেজার: মো: নাইমুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমাদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১
জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ
» আমার সংগঠন-ভাবনা ০৩
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ (মিন্নাতুল বারী) ০৮
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» রামাযানের পূর্বপ্রস্তুতি: আত্মশুদ্ধি ও ইবাদতের পথনির্দেশনা ১০
-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ
» ভালোবাসার রামাযান: ফিরে এলো তাক্বওয়ার মাস ১৪
-আব্দুল্লাহ বিন হাদী
» রামাযানে বেশি বেশি দান ও কুরআন তেলাওয়াত ১৬
-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
» ক্বিয়ামুল লায়ল আদায়ের সহজ উপায় ১৯
-মো. মাযহারুল ইসলাম
» ছিয়াম ও তাক্বওয়ার সমীকরণ ২২
-মেরাজুল ইসলাম প্রিয়
» যাকাতের বিধান ২৩
-মাহবূবুর রহমান মাদানী
» ছাদাক্বাতুল ফিতরের আদ্যোপান্ত ২৬
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী
» ইবাদত হোক আল্লাহর জন্য নিবেদিত ২৯
-মাহমুদ হাসান ফাহিম
» কীভাবে ইসলাম প্রকৌশল বিদ্যা শিখতে এবং প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে *-নাফিউল হাসান* ৩০

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল: জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে উপলব্ধি ও শিক্ষা ৩১
-অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ তরুণ প্রতিভা
» বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আল-কুরআন ৩৪
-মো. জোবাইদুল ইসলাম

◈ দিশারী
» রামাযানের ইফতারী: কত নারীর দুশ্চিন্তার এক নাম ৩৬
-রাকিব আলী

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
» রামাযানের প্রস্তুতি ৩৮
-সীমা বিনতে সিরাজুল ইসলাম

◈ কবিতা ৩৯

◈ সংবাদ ৪১

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

রামাযান: ভালো অভ্যাস গঠনের অনন্য সুযোগ

মানুষ তার অভ্যাসের প্রতিচ্ছবি। যে কাজ মানুষ বারবার ও নিয়মিতভাবে করে, তা তার অবচেতন মনে গভীরভাবে স্থায়ী হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, মস্তিষ্ক সেই কাজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের জন্য সংকেত প্রেরণ করতে থাকে। যেমন, একজন আসক্ত ব্যক্তির জন্য নেশা ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ তার মস্তিষ্ক সেই অভ্যাসের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যায়। শুধু একদিনের উপদেশ বা অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য এই ধরনের অভ্যাস ভাঙার জন্য যথেষ্ট নয়।

তেমনি, যদি কেউ নিয়মিতভাবে ছালাত আদায় না করে, তবে তার মস্তিষ্কও ছালাতের সময়কে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এভাবেই দিনগুলো অজান্তেই পেরিয়ে যায়। এই বদ অভ্যাস পরিবর্তন করে ভালো অভ্যাস গড়ে তুলতে হলে কেবল একটি বক্তৃতা বা দারস যথেষ্ট নয়; বরং নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে অবচেতন মনে সেই ভালো অভ্যাসকে স্থাপন করতে হয়। যখন কেউ প্রতিনিয়ত ছালাত আদায় করবে, তখন মস্তিষ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছালাতকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করবে। এমনকি যদি কোনোদিন ছালাত আদায় না করা হয়, তখন মস্তিষ্কে এক ধরনের অপূর্ণতার অনুভূতি সৃষ্টি হবে, যা মানুষকে পুনরায় সেই অভ্যাসের দিকে ধাবিত করবে।

অভ্যাস গঠনের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সকল মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ! মুসলিমদের জন্য এমন ধারাবাহিক ভালো অনুশীলনের অনন্য এক সুযোগ হলো রামাযান। একটানা নিয়মিত ভালো অভ্যাসগুলো অনুশীলন করলে সেগুলো পরবর্তী সময়েও ধরে রাখা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। আসুন, আমরা দেখি রামাযানে কী কী উত্তম অভ্যাস গড়ে তোলা যায়।

১. সঠিক খাদ্যাভ্যাস: স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য খাদ্যাভ্যাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। খাদ্যাভ্যাস ঠিক না থাকার কারণে বর্তমানে যুগে লিভার, কিডনি ও ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে অসংখ্য মরণব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত। রামাযান মানুষের সঠিক খাদ্যাভ্যাস তৈরিতে অনেক সহযোগিতা করে। দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার মাধ্যমে শরীরের কোষগুলো সজীব হয়, টক্সিন দূর হয়। নবোদ্যমে জেগে ওঠে আমাদের শরীর। রামাযান পার হয়ে যাওয়ার পরেও সাপ্তাহিক ও মাসিক নফল ছিয়ামগুলোর মাধ্যমে আমরা এই অভ্যাসটিকে ধরে রাখতে পারি।

২. নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত: কুরআন তেলাওয়াত মুসলিম জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অভ্যাস। কুরআন বিহীন জীবন পশু-প্রাণীর মতো জীবন। জীবনের সকল চড়াই-উতরাই ও সমস্যায় কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআন অনুধাবন আপনাকে নতুন দিশা দিবে। রামাযানের সাথে কুরআনের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। রামাযান মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের উচিত রামাযানে কুরআন পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। রামাযানই আমাদের জন্য সবচেয়ে মোক্ষম সুযোগ কুরআন শেখার ও কুরআন পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার।

৩. পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের অভ্যাস: রামাযানে আমাদের উচিত দুনিয়াবী কাজ কিছু কমিয়ে ভালো অভ্যাস গড়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া। তন্মধ্যে অন্যতম একটি অভ্যাস হতে পারে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের অভ্যাস। রামাযানে যদি আমরা কোনো কাজই করতে না পারি অন্তত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের টার্গেট করা উচিত। কোনো অভ্যাস গড়ে তুলতে না পারলেও অন্তত ছালাতের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে জীবন সার্থক। ছালাতের চেয়ে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ এই পৃথিবীতে নাই। তাই আসুন! রামাযান পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামাআতে আদায়ের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি।

৪. দান-ছাদাক্বা করার অভ্যাস: মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও প্রশস্ত করতে দান-ছাদাক্বা করার অভ্যাসের বিকল্প নাই। দান এমন এক মহান ইবাদত যা মানুষের গুনাহকে মিটিয়ে দিতে পারে, কবরের আযাবকে কমিয়ে দিতে পারে এবং ক্বিয়ামতের মাঠে বিভিন্ন দেনা-পাওনা পরিশোধে সহযোগিতা করতে পারে। আমাদের প্রতিদিনই কিছু না কিছু দান করা উচিত। সেই দানের অভ্যাস গড়ে তুলতে রামাযানের বিকল্প নাই।

৫. রাতের ছালাতের অভ্যাস: যেকোনো বড় ধরনের সফলতার জন্য রাতের ছালাতের বিকল্প নাই। রাতের ছালাত আদায়ের মতো কঠিন কাজের অভ্যাস আমাদের জন্য রামাযানে সহজ হয়ে যায়। বন্ধুবান্ধব বা প্রিয়জনদের নিয়ে রামাযানের রাতগুলোতে ছালাত আদায়ের পরিবেশ তৈরি করুন। অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় একটি অভ্যাস গড়ে তুলুন। যা আপনার জীবনকে আমূল পরিবর্তন করে ফেলতে পারে।

সর্বোপরি রামাযান মূলত শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাস। শয়তানের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের একটি চ্যালেঞ্জ কোর্স। এই ৩০ দিনের চ্যালেঞ্জে উক্ত অভ্যাসগুলো সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে এই একটি রামাযান আমাদের সমগ্র জীবনের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে ইনশা-আল্লাহ! মহান আল্লাহ কবুল করুন! *(প্র. স.)*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

রামাযান: ভালো অভ্যাস গঠনের অনন্য সুযোগ

মানুষ তার অভ্যাসের প্রতিচ্ছবি। যে কাজ মানুষ বারবার ও নিয়মিতভাবে করে, তা তার অবচেতন মনে গভীরভাবে স্থায়ী হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, মস্তিষ্ক সেই কাজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের জন্য সংকেত প্রেরণ করতে থাকে। যেমন, একজন আসক্ত ব্যক্তির জন্য নেশা ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ তার মস্তিষ্ক সেই অভ্যাসের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যায়। শুধু একদিনের উপদেশ বা অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য এই ধরনের অভ্যাস ভাঙার জন্য যথেষ্ট নয়।

তেমনি, যদি কেউ নিয়মিতভাবে ছালাত আদায় না করে, তবে তার মস্তিষ্কও ছালাতের সময়কে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এভাবেই দিনগুলো অজান্তেই পেরিয়ে যায়। এই বদ অভ্যাস পরিবর্তন করে ভালো অভ্যাস গড়ে তুলতে হলে কেবল একটি বক্তৃতা বা দারস যথেষ্ট নয়; বরং নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে অবচেতন মনে সেই ভালো অভ্যাসকে স্থাপন করতে হয়। যখন কেউ প্রতিনিয়ত ছালাত আদায় করবে, তখন মস্তিষ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছালাতকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করবে। এমনকি যদি কোনোদিন ছালাত আদায় না করা হয়, তখন মস্তিষ্কে এক ধরনের অপূর্ণতার অনুভূতি সৃষ্টি হবে, যা মানুষকে পুনরায় সেই অভ্যাসের দিকে ধাবিত করবে।

অভ্যাস গঠনের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সকল মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ! মুসলিমদের জন্য এমন ধারাবাহিক ভালো অনুশীলনের অনন্য এক সুযোগ হলো রামাযান। একটানা নিয়মিত ভালো অভ্যাসগুলো অনুশীলন করলে সেগুলো পরবর্তী সময়েও ধরে রাখা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। আসুন, আমরা দেখি রামাযানে কী কী উত্তম অভ্যাস গড়ে তোলা যায়।

১. সঠিক খাদ্যাভ্যাস: স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য খাদ্যাভ্যাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। খাদ্যাভ্যাস ঠিক না থাকার কারণে বর্তমানে যুগে লিভার, কিডনি ও ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে অসংখ্য মরণব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত। রামাযান মানুষের সঠিক খাদ্যাভ্যাস তৈরিতে অনেক সহযোগিতা করে। দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার মাধ্যমে শরীরের কোষগুলো সজীব হয়, টক্সিন দূর হয়। নবোদ্যমে জেগে ওঠে আমাদের শরীর। রামাযান পার হয়ে যাওয়ার পরেও সাপ্তাহিক ও মাসিক নফল ছিয়ামগুলোর মাধ্যমে আমরা এই অভ্যাসটিকে ধরে রাখতে পারি।

২. নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত: কুরআন তেলাওয়াত মুসলিম জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অভ্যাস। কুরআন বিহীন জীবন পশু-প্রাণীর মতো জীবন। জীবনের সকল চড়াই-উতরাই ও সমস্যায় কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআন অনুধাবন আপনাকে নতুন দিশা দিবে। রামাযানের সাথে কুরআনের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। রামাযান মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের উচিত রামাযানে কুরআন পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। রামাযানই আমাদের জন্য সবচেয়ে মোক্ষম সুযোগ কুরআন শেখার ও কুরআন পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার।

৩. পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের অভ্যাস: রামাযানে আমাদের উচিত দুনিয়াবী কাজ কিছু কমিয়ে ভালো অভ্যাস গড়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া। তন্মধ্যে অন্যতম একটি অভ্যাস হতে পারে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের অভ্যাস। রামাযানে যদি আমরা কোনো কাজই করতে না পারি অন্তত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের টার্গেট করা উচিত। কোনো অভ্যাস গড়ে তুলতে না পারলেও অন্তত ছালাতের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে জীবন সার্থক। ছালাতের চেয়ে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ এই পৃথিবীতে নাই। তাই আসুন! রামাযান পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামাআতে আদায়ের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি।

৪. দান-ছাদাক্বা করার অভ্যাস: মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও প্রশস্ত করতে দান-ছাদাক্বা করার অভ্যাসের বিকল্প নাই। দান এমন এক মহান ইবাদত যা মানুষের গুনাহকে মিটিয়ে দিতে পারে, কবরের আযাবকে কমিয়ে দিতে পারে এবং ক্বিয়ামতের মাঠে বিভিন্ন দেনা-পাওনা পরিশোধে সহযোগিতা করতে পারে। আমাদের প্রতিদিনই কিছু না কিছু দান করা উচিত। সেই দানের অভ্যাস গড়ে তুলতে রামাযানের বিকল্প নাই।

৫. রাতের ছালাতের অভ্যাস: যেকোনো বড় ধরনের সফলতার জন্য রাতের ছালাতের বিকল্প নাই। রাতের ছালাত আদায়ের মতো কঠিন কাজের অভ্যাস আমাদের জন্য রামাযানে সহজ হয়ে যায়। বন্ধুবান্ধব বা প্রিয়জনদের নিয়ে রামাযানের রাতগুলোতে ছালাত আদায়ের পরিবেশ তৈরি করুন। অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় একটি অভ্যাস গড়ে তুলুন। যা আপনার জীবনকে আমূল পরিবর্তন করে ফেলতে পারে।

সর্বোপরি রামাযান মূলত শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাস। শয়তানের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের একটি চ্যালেঞ্জ কোর্স। এই ৩০ দিনের চ্যালেঞ্জে উক্ত অভ্যাসগুলো সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে এই একটি রামাযান আমাদের সমগ্র জীবনের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে ইনশা-আল্লাহ! মহান আল্লাহ কবুল করুন! *(প্র. স.)*

আমার সংগঠন-ভাবনা

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

বাংলাদেশের আহলেহাদীছদের সংগঠনগুলো নিয়ে আমার ভাবনাগুলো জমতে থাকে বহু আগে থেকে, সেই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থা থেকে। কারণ তখন দেখতাম, আমাদের বাংলাদেশীদের মধ্যে যারা যে অঙ্গন থেকে সেখানে যাচ্ছেন, কেবল তারাই পরস্পর আন্তরিকতার সাথে মিশছেন; পরস্পরকে দাওয়াত দিচ্ছেন ও নিচ্ছেন। অন্যদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করছেন। অন্যদের ব্যাপারে এক ধরনের কানাঘুষা করছেন। এটা শুধু আহলেহাদীছদের ক্ষেত্রে ঘটত না; বরং অন্যদের ক্ষেত্রেই ঘটত।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এমন প্রশস্ত আঙিনায় এমন সংকীর্ণতা আমাকে খুবই অবাক, ব্যথিত ও মর্মাহত করত। ফলে আমাদের এমন অবস্থান ঠিক হচ্ছে কিনা খোঁজাখুঁজি শুরু করি। বেরিয়ে আসতে থাকে থলের বিড়াল। সাংগঠনিক ইস্যু নিয়ে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য ও মন্তব্য খুঁজতে থাকি। মূলত সেখান থেকেই **'দল, সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত সম্পর্কে বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের বক্তব্য'** শীর্ষক বইটি প্রথমে সংকলন করি আরবী ভাষায়; পরবর্তীতে যার বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন হয় ও প্রকাশিত হয় আল-হামদুলিল্লাহ।

তখন থেকে অদ্যাবধি বিশেষভাবে আহলেহাদীছ সংগঠনগুলোর উপর আমার হৃদয়গহীনে জমানো ভাবনাগুলোর সারসংক্ষেপ সম্প্রতি **'আমার সংগঠন-ভাবনা'** শিরোনামে লিপিবদ্ধ করি। এই লেখাটির পেছনে আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংগঠনের ব্যাপারে একটি সঠিক ধারণা তুলে ধরে অন্ধত্ব থেকে বের করে আনা এবং আমাদের একই আক্বীদা ও মানহাজের ভাইদের মধ্যকার দূরত্ব কমানো।

আল্লাহর কসম! আমি আসলে সংগঠনবিরোধী নই এবং আমি কারও ক্রীড়ানক ও পক্ষ হয়েও কথাগুলো বলছি না এবং আগেও কখনও বলিনি; বরং ইলমী আমানতের জায়গা থেকে কথাগুলো বলছি এবং কুরআন-হাদীছের আলোকে সালাফে ছালেহীনের বুঝনির্ভর নিরপেক্ষ অবস্থান এটাই।

[১]

এখানে সংগঠন বলতে শুধু বাংলাদেশের আহলেহাদীছদের দাওয়াতী সংগঠন উদ্দেশ্য। এখানে অন্য কোনো সংগঠনকে বুঝানো হয়নি। সুতরাং আমার কথাগুলো শুধু আমাদের আহলেহাদীছদের দাওয়াতী সংগঠনগুলোকে নিয়ে।

একটি জরুরী জ্ঞাতব্য, বাংলাদেশের আহলেহাদীছদের দাওয়াতী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন হলেও তাদের আক্বীদা, আমল, লেনদেন, আখলাক সবই এক রকম। এমনকি যারা আক্ষরিক অর্থে সংগঠনের নেতা, সদস্য বা সমর্থক হয়ে কাজ করেন না; বরং নিজেদের মতো করে দাওয়াতী কাজ করেন, কিন্তু সংগঠনের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে আপত্তি করেন না, তারাও ঠিক ঐ একই বিষয় ধারণ ও লালন করেন। সেজন্য, নিঃসন্দেহে আহলেহাদীছগণ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী আল-হামদুলিল্লাহ।

[২]

আমাদের সংগঠনগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। যুগ যুগ ধরে সংগঠনগুলো এদেশে কুরআন-হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে। এসব সংগঠন যুগ যুগ ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সারাদেশে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত তাওহীদ ও সুন্নাতের আলো দিয়ে এদেশের প্রতিটি ঘরকে আলোকিত করার কাজ করে যাচ্ছে। যাবতীয় শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার, অন্যায়-অনাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধেও আমাদের সংগঠনগুলো অত্যন্ত সোচ্চার।

এদেশে অসংখ্য মসজিদ ও অগণিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে যাচ্ছে সংগঠনগুলো। এদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও তাদের রয়েছে অসামান্য অবদান।

বিশেষ করে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক অঙ্গনেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান রেখে চলেছে সংগঠনগুলো।

তারা এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী।

বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝিতে অবস্থান করে সংগঠনগুলো দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায়ও কাজ করে যাচ্ছে।

অসহায়, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ায় এসব সংগঠন। বিশেষ করে বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে তারা। এভাবে আরও অনেক অবদানের কথাই বলা যাবে, যেগুলো এসব সংগঠন রেখে যাচ্ছে।

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

[৩]

এরপর যে বিষয়টি খোলাসা করা জরুরী মনে করছি, তা হচ্ছে এই যে, মূলত আহলুল হাদীছ বা আহলেহাদীছ বা আছহাবুল হাদীছ বলতে শুধু জন্ম বা বংশসূত্রের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বুঝানো হয় না অথবা নির্দিষ্টভাবে কোনো জামা'আত, দল, মাযহাব বা সংগঠনকে বুঝানো হয় না। বরং যিনিই যথার্থভাবে সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি অনুযায়ী কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বুঝবেন এবং সেই মোতাবেক আমল করবেন, তিনিই আহলেহাদীছ। মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সদস্যদের মুক্তির মানদণ্ড হিসেবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **'আমি ও আমার ছাহাবীবৃন্দ যে মানহাজের উপর আছি, (সেই মানহাজের উপর যারা থাকবে, তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে)'।** সুতরাং এই মানহাজ অনুযায়ী যারাই চলবে, তারাই নাজাতপ্রাপ্ত, তারাই আহলেহাদীছ। আহলেহাদীছগণ বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগত নামে অভিহিত হয়েছেন। যেমন: আল-জামা'আহ, আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, আত-ত্বয়েফাহ আল-মানছূরাহ (বিজয়ী দল), আল-ফেরক্বাহ আন-নাজিয়াহ (মুক্তিপ্রাপ্ত দল), আহলুল হাদীছ/আহলেহাদীছ (কুরআন-হাদীছের অনুসারী), আছহাবুল হাদীছ, আহলুল আছার, সুন্নী, সালাফী ইত্যাদি। এসবগুলো নামেই তারা পরিচিত। তাদের নির্দিষ্ট একটি স্থানে সংঘবদ্ধ থাকা জরুরী নয়; বরং একেক জন একেক রকম দ্বীনী মিশন নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারেন।

তবে, হ্যাঁ, যদি তারা পৃথিবীর কোথাও কোথাও একই সাথে মিলেমিশে থাকতে পারেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তা কল্যাণকর। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে মিলেঝুলে থাকতে গিয়ে যদি তা আরও বিভক্তি ও টুকরো টুকরো হওয়ার কারণ হয়, তাহলে অবশ্যই সংশোধনী দরকার।

নোট: কোনো দল যদি নিজেদেরকে 'আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' বা 'সুন্নী' নামে নামকরণ করে হরহামেশা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতি বিরোধী কাজ করে এবং নানামুখী শিরক-বিদ'আতই তাদের সাধনা হয়, তাহলে এই নামকরণ তাদের বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না; বরং তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে; যেমনটি আমাদের দেশের কিছু মানুষ 'আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' বা 'সুন্নী' নাম দু'টির মতো পবিত্র নাম ব্যবহার করে শিরক-বিদ'আতে নিমজ্জিত রয়েছে।

[৪]

বৃহত্তর পরিধিতে সংঘবদ্ধভাবে সহজে দ্বীন প্রচারের কাজ করার জন্যই মূলত দাওয়াতী সংগঠনের প্রয়োজন পড়ে। বিশেষ করে যেসব দেশে ইসলামী নিয়মে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না বা যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু বা যেসব দেশে মুসলিমরা বৈষম্যের শিকার, সেসব দেশে এ ধরনের সংগঠনের বেশি দরকার হয়। বরং কখনও কখনও এমন সংগঠন জরুরীও হয়ে পড়ে। কারণ এসব পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের সংগঠন বা প্লাটফর্ম না থাকলে তারা দুর্বল ও কোণঠাসা হয়ে পড়তে পারে। সেই অর্থে সংগঠনের প্লাটফর্মে জমায়েত হয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করাতে কোনো সমস্যা দেখি না; বরং হওয়াই দরকার, বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের মতো প্রেক্ষাপটে।

[৫]

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছদের দাওয়াতী সংগঠন একটি থাকাই বেশি ভালো ও কল্যাণকর এবং অধিক শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচায়ক। তবে, কোনো কারণবশত বা প্রয়োজনের তাগিদে একাধিক সংগঠন হয়ে গেলেও পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষের কিছু নেই; বরং পরস্পর উঠাবসা করা, স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখা, পরস্পরের সাথে সহযোগিতা বজায় রাখা উচিত। কারণ ওদের যে লক্ষ্য, এদেরও সেই একই লক্ষ্য। ওরা যা করতে চান, এরাও তাই করতে চান।

তাছাড়া অন্যদিক বিবেচনায় একাধিক প্লাটফর্ম তৈরি হলে কাজের পরিধি বাড়তে পারে, যেমনটি এখন কাজের পরিধি অনেক বেড়েছে আল-হামদুলিল্লাহ; সেটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলেন বা অন্য কোনো দিক। এখন শুধু দরকার পরস্পরে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে কাজ করা, ভিন্ন সংগঠনে থাকলেও তা সম্ভব বৈকি। কারণ আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হলেও আমাদের সিলেবাস কিন্তু এক ও অভিন্ন।

পারস্পরিক এই স্বাভাবিক সম্পর্ক যতক্ষণ বজায় রাখা যাচ্ছে না, ততক্ষণ 'অলা-বারা' তথা আন্তরিক সম্পর্ক রাখা বা না রাখার আক্বীদা প্রশ্নবিদ্ধ রয়েই যাবে। এটা স্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়; বরং আক্বীদার বিষয়। সংগঠনের ভ্রাতৃত্বই মুখ্য; ঈমানী ভ্রাতৃত্ব গৌণ— এমনটি হতে পারে না।

কেউ বলতে পারেন, 'অলা-বারা'-এর নীতি লঙ্ঘন ও বিভক্তি-বিভাজনের যে বিষয়টি সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, তা তো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ফাউন্ডেশন, ট্রাস্ট ইত্যাদিতেও দেখা যায়। তাহলে এই বিষয়টি শুধু সংগঠনের সাথে জড়াচ্ছেন কেনো? এর উত্তর হচ্ছে, এ বিষয়টি আমি শুধু সংগঠনের সাথে জড়াতে নারাজ; বরং আমি বলতে চাই, এগুলো সর্বদা ও সব জায়গায় নিন্দনীয়। ফলে যেখানেই ঘটুক, সেখানেই সেগুলো বর্জনীয়। তবে এগুলো সংগঠনের ক্ষেত্রে পরিমাণে অনেক বেশি ঘটে এবং দেশব্যাপী, এমনকি

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যাপক আকারে ঘটে, অনেকটা মহামারির মতো। কিন্তু প্রতিষ্ঠান, ফাউন্ডেশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেভাবে ঘটে না।

[৬]

দলাদলি, স্বদলপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, একগুঁয়েমি ইত্যাদি, যাকে আরবীতে আছাবিয়্যাত, হিযবিয়্যাত ইত্যাদি বলা হয়— তার সবটা সবখানেই বর্জনীয়। মনে রাখতে হবে, রাসূল ﷺ এই আছাবিয়্যাতের কবর রচনা করেছেন। 'আনছার' ও 'মুহাজির'-এর মতো স্বীকৃত ও প্রশংসিত শব্দযুগল ও পক্ষদ্বয়কে উল্লেখ করে যখন দুইজন ছাহাবীর মধ্যকার ঝগড়া চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তখন রাসূল ﷺ এহেন কাজকে জাহিলী নিনাদ ও নোংরা-পচা হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

ফলে আমাদের পক্ষপাতদুষ্ট হলে চলবে না। আমাদের কল্যাণচিন্তা, পরোপকারিতা, সাহায্য-সহযোগিতা, বেদনা-সহমর্মিতা, স্নেহ-ভালোবাসা, সম্মান-মর্যাদা ইত্যাদিকে সাংগঠনিক ও দলীয় দেওয়াল পেরিয়ে বাইরে বের করতেই হবে। সংগঠনের ঊর্ধ্বে উঠে আক্বীদা-মানহাজের বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে পরহেযগারিতা, দ্বীনদারিতা, আমানতদারিতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা ইত্যাদির মূল্যায়ন করতেই হবে।

এগুলোকে স্রেফ দলীয় ফ্রেমে বাঁধলে তা হবে জাহিলিয়্যাত। এগুলোই হবে হিযবিয়্যাত বা দলাদলি ও ফেরক্বাবন্দি। এগুলোই হবে, আছাবিয়্যাত বা অন্ধভক্তি ও গোঁড়ামি।

অতএব, আমাদের সংগঠনগুলো থেকেও এই জাহিলিয়্যাত তাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, দাওয়াতী কাজে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা কাম্য, কিন্তু হিযবিয়্যাত ও আছাবিয়্যাত কাম্য নয়।

[৭]

সংগঠনের অধীনে কাজ করার সময় অবশ্যই কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। যেমন— (১) সংগঠনে কুরআন-হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি পরিপন্থি কোনো কার্যক্রম থাকবে না। (২) সংগঠনে বায়'আত বলে কিছু থাকবে না। কারণ, বায়'আত কেবল মুসলিম রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে নির্দিষ্ট; কোনো সংস্থা, সংগঠন, দল বা জামা'আতের নেতার জন্য তা আদৌ বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কোনো শপথ, অঙ্গীকার ইত্যাদিও থাকবে না। ইসলামের যে অঙ্গীকারের মধ্যে আমরা রয়েছি, সেটাই যথেষ্ট। (৩) ঈমানী মহান ও প্রশস্ত ভ্রাতৃত্বের গণ্ডিকে সাংগঠনিক সংকীর্ণ ভ্রাতৃত্বের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার অপচেষ্টা থেকে দূরে থাকতে হবে। (৪) সংগঠনের ভেতরের এবং বাইরের বিশুদ্ধ আক্বীদা, মানহাজ ও আমলের সকল মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকতে হবে, একে অন্যের দোষত্রুটি না বলে ভালো দিকগুলো বলতে হবে এবং কারো মধ্যে বিদ্যমান ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের জন্য হিকমতের সাথে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। (৫) সংগঠনকে দাওয়াতের একটি মাধ্যমের বাইরে অন্য কিছু মনে করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, দাওয়াতী সংগঠন কখনই হক্ব-বাতিলের মানদণ্ড বিবেচিত হতে পারে না। (৬) মানুষকে সংগঠনের পতাকাতলে আহ্বান না জানিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আহ্বান জানাতে হবে। (৭) এখানে অন্ধভক্তি থাকা যাবে না। মনে রাখতে হবে, অতিভক্তি ও অন্ধভক্তি সর্বত্রই বর্জনীয়।

[৮]

জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে— একথাই ঠিক। তবে জামা'আত মানে শুধুই সংগঠন নয়। ইসলাম মানেই সংগঠন—এমন চিন্তাও রীতিমত সীমালঙ্ঘন। অথচ আমাদের অনেকের অবস্থা দেখে এমনটাই ফুটে ওঠে। যে ব্যক্তি যে সংগঠনে রয়েছেন, তার কাছে সেটাই হচ্ছে 'জামা'আত'। সেটাকে ঘিরেই তার যত জল্পনাকল্পনা। সেদিকে আহ্বান ও দল ভারী করাই তার একমাত্র মিশন। সেখানকার মানুষের জন্যই তার যত ভালোবাসা। এর বাইরে যেন তার দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করেই না। বরং তার সেই গণ্ডির বাইরের সব মত, পথ, দল বা সংগঠনই তার চোখে বিভক্তি আর বিশৃঙ্খলা। বাইরের সবাই তার কাছে জামা'আতত্যাগী। আর আমাদের পারস্পরিক কামড়াকামড়ি দেখে মনে হয়, সংগঠন অহী; বরং তারচেয়েও বেশি কিছু।

যুগ যুগ ধরে সারাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কোনো-না কোনো সংগঠনের প্রভাব থাকার কারণে হয়তো অনেকের রক্ত-মাংসে এধরনের চিন্তা-চেতনা মিশে আছে, যা সম্পূর্ণ ভুল।

জামা'আতবদ্ধ থাকার আয়াত ও হাদীছগুলোকে কেবল সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া নেহায়েত অন্যায়। বরং হাদীছে উল্লিখিত জামা'আত শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপক।

[৯]

হাদীছে উল্লিখিত জামা'আত থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং বের হওয়ার দুনিয়াবী কুফল ও পরকালীন আযাব সম্বলিত দলীলগুলোকে স্বজামা'আতের বাইরের লোকদের উপর প্রয়োগ করা মারাত্মক সীমালঙ্ঘন। জাহিলী মৃত্যু হওয়া বা ইসলামের গণ্ডি থেকে তার গর্দান বের হয়ে যাওয়া বা জাহান্নামের দলভুক্ত হয়ে যাওয়া— এ ধরনের যত হাদীছ আছে, সেগুলোকে অন্য সংগঠন ও তার লোকজনের উপর প্রয়োগ করা মারাত্মক অপরাধ; সাথে সাথে হাদীছগুলোর

চরম অপব্যাখ্যাও বটে। আর এটা কিন্তু কোনো ঠুনকো বিষয় নয়; বরং অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ বিষয়। কারণ, কেউ যখন কোনো দল বা সংগঠন ও এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের স্বরূপ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে গিয়ে এ হাদীছ ('যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে ইসলামের রজ্জু তার গর্দান হতে খুলে ফেলল') পেশ করছে, তখন কিন্তু সে প্রকারান্তরে তার জামা'আত, দল বা সংগঠনের বাইরের সবাইকে 'ইসলামের বাইরের' বা 'কাফের' গণ্য করছে! -নাঊযুবিল্লাহ- সেটা সে মুখে বলুক বা না বলুক; স্বীকার করুক বা না করুক।

[১০]

আমাদের কোনো সংগঠনকে এই ভেবে গোঁ করে বসে থাকা যাবে না যে, মহান আল্লাহর যে রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে বিভক্তি সৃষ্টি করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই মানদণ্ড শুধু সেই সংগঠনের মধ্যেই রয়েছে। ফলে, অন্যদেরকে তাদের পতাকাতলেই সমবেত হতে হবে এবং তাদের সংগঠনে যুক্ত হয়ে তাদের নেতৃত্বেই চলতে হবে। এভাবে গোঁ করে বসে থাকলে ক্ষত আরও গভীর হবে, বিভেদ আরও বাড়বে এবং একতাবদ্ধ থাকার আয়াত ও হাদীছগুলো মুখে আওড়ালেও কোনো ফায়দা হবে না। দলে ঢুকতেই হবে এবং ঢুকে অন্ধ হয়ে যেতে হবে— এ দুটোই ভুল ধারণা।

মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকের সংগঠনে যোগ দেওয়া জরুরী নয়। ফলে সংগঠনের সদস্য না হলে সে আমার শত্রু নয়। বরং যে কেউ সালাফী মানহাজের উপর অবিচল থেকে দ্বীন ও দুনিয়ার কাজ করে গেলেই যথেষ্ট এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজে থাকার কারণে সে আমার ভাই। দলের সদস্য না হয়েও পরস্পর হৃদ্যতা ও সহযোগিতা বজায় রাখা যায়।

[১১]

যেসব হাদীছে জামা'আত ও ইমারতের কথা এসেছে, সেই জামা'আত দ্বারা কোনোভাবেই প্রচলিত কোনো সংগঠনকে বুঝানো হয়নি। এসব হাদীছের ব্যাখ্যায় অগ্রজ-অনুজ সকল উলামায়ে কেরামের বক্তব্যে এটাই ফুটে উঠে। সুতরাং নিজের সংগঠনকে সেই জামা'আত হিসেবে গণ্য করে উল্লসিত হওয়া এবং অন্যকে জামা'আতচ্যুত দাবি করা বোকামি বৈকি! মনে রাখতে হবে, প্রচলিত কোনো সংগঠন থেকে বের হয়ে গেলে কেউ অমুসলিম হয়ে যায় না, হয় না দলত্যাগী ও জামা'আতত্যাগীও।

প্রতিটি সংগঠন যতদিন এসব হাদীছ দিয়ে এই দলীল নিবে যে, অন্যরা জামা'আতচ্যুত এবং হক্ব কেবল তাদের নিজেদের সাথেই রয়েছে, ততদিন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এমন চিন্তা-চেতনা থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে।

[১২]

সংগঠন স্রেফ দ্বীন প্রচারের মাধ্যম; এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। যাহোক, আল্লাহর দিকে দাওয়াত এবং এর মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি আমাদের মূল লক্ষ্য। আর সংগঠন হচ্ছে সেই লক্ষ্য পূরণের একটি মাধ্যম মাত্র; এর বাইরেও অনেক মাধ্যম রয়েছে। সুতরাং এটিকে কোনোভাবেই লক্ষ্যে পরিণত করা যাবে না। কিন্তু আমাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, সংগঠনই আমাদের মূল লক্ষ্য আর দ্বীন প্রচার গৌণ।

[১৩]

নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে কেবল আল্লাহর জন্য, ইসলামের জন্য; কোনো সংগঠনের জন্য নয়। যদি বলা হয়, সংগঠনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া মানেই তো ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া, তাহলে বলব, মধ্যস্থতায় না বলে সরাসরি 'ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ' বলতে সমস্যা কোথায়? বরং 'অমুক আমাদের সংগঠনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ'— এধরনের বাক্যে জাহিলিয়্যাতের দুর্গন্ধ স্পষ্ট। কারণ সাধারণত নিজ সংগঠনের প্রতি যে যত কট্টর ও অন্ধভক্ত এবং অন্য সংগঠনের প্রতি যত বেশি বিদ্বেষী, তাকে তত বেশি নিবেদিতপ্রাণ গণ্য করা হয়!

অনুরূপভাবে আমি মনে করি, একই কারণে কাউকে সংগঠনের কর্মী হিসেবে অভিহিত না করে দ্বীনের কর্মী হিসেবে আখ্যায়িত করা উচিত। সংগঠনের কর্মী, সংগঠনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ— এধরনের শব্দচয়নের মধ্যে জাহিলিয়্যাতের দুর্গন্ধ বিদ্যমান।

[১৪]

সংগঠন করতে গেলে অবশ্যই নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে এবং যেখানে নেতৃত্ব আছে, সেখানে আনুগত্যেরও বিষয় আছে। সেজন্য, আল্লাহর অবাধ্যতা হয় না— এমন বিষয়ে যে-কোনো ভালো নেতৃত্বের আনুগত্য করা দরকার। অন্যথা কোনো কিছুই সুচারুরূপে চলতে পারে না। তবে 'উলিল আমর'-এর অনুসরণ দ্বারা এখানে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির অনুসরণ বুঝানো হয়নি। সেজন্য এটিকে শুধু সাংগঠনিক নেতৃত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা যথার্থ নয়।

[১৫]

পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, কাদা ছোড়াছুড়ি, পরস্পরকে প্রতিহত করার অপচেষ্টা তো করা যাবেই না। এমনকি মুরব্বী

সংগঠন, প্রাচীন সংগঠন, বৃহত্তম সংগঠন; অপরদিকে সক্রিয় সংগঠন, প্রভাব বিস্তারকারী সংগঠন, মেহনতী দল, বলিষ্ঠ যুবশক্তি ইত্যাদি বিশেষণ নিয়ে গোঁ ধরে বসে থাকলে আর তৃপ্তির ঢেকুর তুললে দূরত্ব বাড়তেই থাকবে। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্যের নেই। অতএব, নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে অহমিকা প্রদর্শন করে ও অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে জিদ ধরে বসে থাকলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। বরং দূরত্ব ধীরে ধীরে বাড়বে; কমবে না।

অনুরূপভাবে আমরা যুগ যুগ ধরে দেখে আসছি যে, 'দরজা খোলা আছে', 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো'— এসব ডায়ালগও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আবার কাউকে দেখে আসছি, আদর্শের দোহাই দিয়ে নিজেদেরকে তালাবদ্ধ রাখতে। আসলে এভাবে বুলি আওড়িয়ে একতাবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

তেমনিভাবে একটি সংগঠন ভেঙে দিয়ে তার নেতাকর্মী ও সদস্য-সমর্থকবৃন্দ অপর সংগঠনে সুড়সুড় করে ঢুকে পড়বে— এমন পরিস্থিতি এখন মোটেও নেই এবং এমনটা আশা করা আকাশকুসুম চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু আমি থাকব আর কেউ থাকবে না— এমন ভাবা কি ঠিক হবে?

[১৬]

অতএব, মন পরিষ্কার করে পরস্পরের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করতে হবে। উদারতা প্রদর্শন করে পরস্পরকে দাওয়াত দিতে হবে ও দাওয়াত গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, উপলক্ষ্য ও প্রোগ্রামে পরস্পরকে দাওয়াত দিতে হবে এবং দাওয়াত পেলে সেটাকে যে-কোনো উপায়ে দূরে ঠেলে না দিয়ে সাদরে গ্রহণ করতে হবে এবং অংশগ্রহণ করতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে দূরত্ব কমিয়ে পরস্পর কাছে আসা সম্ভব ইনশা-আল্লাহ।

[১৭]

ইসলাম ও ঈমানের বিষয় এবং দেশ ও জাতীয় ইস্যুগুলোর মতো বড় বড় ইস্যুতে আমাদের সংগঠনগুলোকে পরস্পরের কাছাকাছি আসতেই হবে। এক মঞ্চে সবাইকে উঠতেই হবে। এক কণ্ঠে সবাইকে কথা বলতেই হবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেই হবে। এভাবেই নিজেদের শক্তির জানান দিতে হবে। এভাবে যত ঐক্যবদ্ধ হওয়া যাবে, তত আহলেহাদীছদের শক্তি আরও বেশি সঞ্চারিত হবে। রাষ্ট্র বিনির্মাণে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে। এধরনের ইস্যুতে সাংগঠনিক দেওয়াল টপকে কেবল আহলেহাদীছ পরিচয়ে ও আহলেহাদীছ ব্যানারে সকলকে এক কণ্ঠে কথা বলতেই হবে। তা করতে ব্যর্থ হলে আহলেহাদীছগণ অপাঙক্তেয়, অবহেলিত ও অবমূল্যায়িত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যাবে।

[১৮]

আহলেহাদীছদের বিভিন্ন দাওয়াতী সংগঠন, ফাউন্ডেশন বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বীগণের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, সাধারণ জনগণ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা একতা চান, তারা আপনাদের পরস্পরের মাঝে সুসম্পর্ক দেখতে চান, এক মঞ্চে দেখতে চান এবং এগুলো তাদেরকে যারপরনাই উল্লসিত করে।

পক্ষান্তরে, আপনাদের পারস্পরিক অনৈক্য, বিভক্তি-বিভাজন, হিংসা-বিদ্বেষ, কাদা ছোড়াছুড়ি তাদেরকে ভীষণ ভাবায় ও কষ্ট দেয়।

সুতরাং কুরআনে কারীম ও হাদীছে নববীর দিকনির্দেশনা ধারণ করে এবং সাধারণ জনগণের আবেগ ও চাওয়াকে সামনে রেখে পরস্পর কাছাকাছি আসার চেষ্টা করুন। অন্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দকে নিজেদের প্রোগ্রামগুলোতে ডাকুন; অন্যদের প্রোগ্রামে দাওয়াত দিলে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আপনারা কাছাকাছি আসতে পারলে জনগণের কাছাকাছি আসা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। মনে রাখবেন, চুল টানলে মাথা আসে।

জনগণ আপনাদের মুখপানে তাকিয়ে, আপনারা কী সিদ্ধান্ত ও ভূমিকা গ্রহণ করেন, তা দেখার অপেক্ষায়।

[১৯]

এই হচ্ছে, আমাদের সংগঠনগুলোর ব্যাপারে আমার অবস্থান। আমি আসলে সংগঠনবিরোধী নই। তবে, সংগঠন করতে গিয়ে যদি সংগঠনে বায়'আতের মতো ইস্যুর অনুপ্রবেশ ঘটে, 'অলা-বারা'-এর নীতি লঙ্ঘিত হয়, পরস্পরের মাঝে দূরত্ব বাড়তে বাড়তে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়, বিভেদ-বিভক্তি তৈরির প্লাটফর্মে পরিণত হয়, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত-তোহমত ডালভাতে পরিণত হয়, তাহলে আমি শুধু সেগুলোর বিরোধী; সংগঠনের বিরোধী নই। সংগঠন নামক এই বৈধ মাধ্যমটি ধরতে গিয়ে কোনোভাবেই এতসব কাবীরা গোনাহ করা যাবে না। সেজন্য, এসব হতে দূরে থেকে কেউ সংগঠনের অধীনে কাজ করলে তাতে কোনো আপত্তি নেই। বরং আমাদের দেশের মতো জায়গায় ও প্রেক্ষাপটে ইসলামের নির্দেশনা মেনে সাংগঠনিকভাবে কাজ করা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

মহান আল্লাহ আমাদের বুঝা ও মানার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

(মিন্নাতুল বারী)

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান অর্জন না করলে মানুষ ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করতে পারবে না। সঠিক আমলের জন্য সঠিক জ্ঞান অতীব জরুরী। তাই ঈমানের অধ্যায়ের পর ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ জ্ঞানের অধ্যায় রচনা করেছেন।

জ্ঞানের পরিচয় ও প্রকার:

জ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন গোলাপ ফুলের গন্ধের কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এই বিষয়গুলো মানুষ জন্মগতভাবেই অনুভব করে থাকে। যেহেতু এগুলো দৃশ্যমান কোনো বিষয় নয়, সেহেতু এগুলোর সংজ্ঞা নির্ধারণও সম্ভব নয়।

জ্ঞানের প্রকার: জ্ঞানকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়। তবে আমরা অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত রেখে জ্ঞানকে শুধু দুই ভাগে বিভক্ত করতে চাই।

শারঈ জ্ঞান: এই অধ্যায়ে জ্ঞান দ্বারা মূলত শারঈ জ্ঞান উদ্দেশ্য। কুরআন ও হাদীছে জ্ঞানের যত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তার সবকিছুই মূলত শারঈ জ্ঞানের জন্য প্রযোজ্য। শারঈ জ্ঞান ফরযে আইন তথা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।

দুনিয়াবী জ্ঞান: দুনিয়াবী জ্ঞান ফরযে কিফায়াহ। তবে নিয়্যতের কারণে সকল দুনিয়াবী জ্ঞানকেও নেকীতে পরিণত করা যায়। যদি দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন দ্বারা উদ্দেশ্য হয় মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম দেশের কল্যাণে কাজে লাগানো, মানুষের সেবা করা, গরীব-দুঃস্থ মানুষের দুঃখ মোচন করা, অসহায় আত্মীয়স্বজনের পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি, তাহলে অবশ্যই দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন থেকেও নেকী অর্জিত হবে, ইনশা-আল্লাহ!

بَابُ فَضْلِ العِلْمِ (জ্ঞান অর্জনের ফযীলত)

এটা ‘কিতাবুল ইলম’-এর প্রথম অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদের অধীনে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। কোনো হাদীছ উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো হাদীছ উল্লেখ না করার কারণ:

ছহীহ বুখারীতে প্রায় শতাধিক জায়গা এমন রয়েছে, যেখানে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ অনুচ্ছেদ রচনা করলেও তার অধীনে কোনো হাদীছ নিয়ে আসেননি। আর এই ধরনের অনুচ্ছেদগুলো সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথমত: কিছু অনুচ্ছেদের অধীনে সরাসরি কোনো মুসনাদ হাদীছ না থাকলেও মুআল্লাক্ব হাদীছ, আয়াত ও সালাফে ছালেহীনের আছার থাকে।

দ্বিতীয়ত: কিছু অনুচ্ছেদ এমন রয়েছে, যার অধীনে কোনো হাদীছ বা সালাফে ছালেহীনের আছার নেই, তবে অনুচ্ছেদের নামের সাথেই কুরআনের আয়াত সম্পৃক্ত থাকে।

তৃতীয়ত: কিছু অনুচ্ছেদ এমন রয়েছে, যার অধীনে কোনো হাদীছ, আয়াত ও সালাফে ছালেহীনের আছার নেই এবং অনুচ্ছেদের নামের সাথেও কোনো হাদীছ বা আয়াত সংযুক্ত নেই। তবে সেক্ষেত্রে অধ্যায়ের অর্থ প্রমাণ করার জন্য অধ্যায়ের পূর্বে অথবা পরে সেই ধরনের অর্থবোধক আয়াত ও হাদীছ পাওয়া যায়।

তবে এভাবে হাদীছবিহীন অনুচ্ছেদ রাখার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে অনুচ্ছেদকে প্রমাণ করতে পারবে এমন হাদীছ ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর শর্ত অনুযায়ী না পাওয়া। যেমন এই অনুচ্ছেদে ইলমের ফযীলতের প্রমাণে পেশ করার মতো একটি ছহীহ হাদীছ হতে পারত এই হাদীছটি, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. ‘যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের রাস্তায় বের হলো, মহান আল্লাহ তার জান্নাতে যাওয়ার রাস্তাকে সহজ করে দেন’।[১]

এই হাদীছটি ছহীহ হলেও ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর শর্ত পূরণ করতে না পারায় তিনি তা উল্লেখ করেননি।

আর ছহীহ বুখারীর শর্ত পূরণ করতে পারে এমন হাদীছ পাওয়া গেলেও সেই হাদীছটি হয়তো ইতঃপূর্বে বা পরে কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য বারবার একই হাদীছ প্রয়োগ করতে না চাওয়া থেকেও অনুচ্ছেদগুলো এভাবে হাদীছবিহীন থেকে গেছে।

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. তিরমিযী, হা/২৬৪৬।

অনুচ্ছেদে উল্লেখিত দুটি আয়াত:

প্রথম আয়াত:

﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

এই আয়াতের পূর্ণরূপ এরকম—

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

‘হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় মজলিস প্রশস্ত করো, তখন তোমরা মজলিস প্রশস্ত করে দাও! মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন আর যখন মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার জন্য বলা হয়, তখন উঠে যেয়ো। যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনয়ন করেছে এবং যাদেরকে মহান আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন তাদের সম্মান মহান আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন। আর তোমরা যা করো, সে বিষয়ে মহান আল্লাহ সম্যক অবগত’ *(আল-মুজাদালা, ৫৮/১১)*।

দলীলের যৌক্তিকতা: উক্ত আয়াতটি মূলত আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর নিকট ছাহাবীগণের বসার বিন্যাস নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াত প্রমাণ করে জ্ঞানীদের জন্য দুনিয়াতেও মহান আল্লাহ বিশেষ সম্মান দিয়েছেন। যেমন- ছালাতের কাতারের ক্ষেত্রে জ্ঞানীদেরকে ইমামের নিকটে থাকার নির্দেশ *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/৪০-৫০)*, ইমাম নির্বাচনে জ্ঞানীদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানীদের সম্মানের বিষয়টি উক্ত আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াত:

﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

আয়াতটির পূর্ণরূপ এরকম—

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

‘সুতরাং আল্লাহ মহান, যিনি সত্যিকার মালিক, আপনার প্রতি অহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবেন না এবং আপনি বলুন, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন’ *(ত্বা-হা, ২০/১১৪)*

দলীলের যৌক্তিকতা: আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে জ্ঞান চাওয়ার জন্য দু‘আ করতে বলা হচ্ছে। নবী ﷺ -এর মতো জ্ঞানী ব্যক্তিকে আরও অতিরিক্ত জ্ঞানের জন্য দু‘আ করার আদেশ দেওয়া প্রমাণ করে, জ্ঞান অবশ্যই অতি মূল্যবান একটি বিষয়।

সুতরাং প্রথম আয়াত থেকে জ্ঞানীদের মর্যাদা ও দ্বিতীয় আয়াত থেকে জ্ঞানের মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

রামাযানের পূর্বপ্রস্তুতি: আত্মশুদ্ধি ও ইবাদতের পথনির্দেশনা

-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ*

ভূমিকা: রামাযান মাস কুরআন মাজীদ নাযিলের মাস। ক্ষমা, রহমত ও মুক্তির অনন্য বার্তা নিয়ে শ্রেষ্ঠ মাস রামাযান আমাদের নিকটে প্রায় সমাগত। এ মাসের ইবাদতের মর্যাদা অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক। প্রত্যেক মুমিনের হৃদয় এই মহা সম্মানিত মাসের অপেক্ষায় সদা উদগ্রীব থাকে। এ মাসে মুমিন বান্দারা যাতে সুন্দর ও নিরাপদে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে, সেজন্য শুধু এ মাসে দুষ্টু জিনদেরকে আবদ্ধ করে রাখা হয়; অথচ আমরা পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া এ মাসে পদার্পণ করে তা অলসতা, অবহেলায় অতিবাহিত করি। সুন্দরভাবে ও ইবাদতের মাধ্যমে মহিমান্বিত রামাযান মাসকে অতিবাহিত করতে পূর্বপ্রস্তুতির বিকল্প নেই। তাই আজকের প্রবন্ধে 'রামাযানের পূর্বপ্রস্তুতি: আত্মশুদ্ধি ও ইবাদতের পথনির্দেশনা'— এই শিরোনামে আলোচনা করার প্রয়াস পাব, ইনশা-আল্লাহ।

রামাযানের পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ:

(১) রামাযান মাসব্যাপী ইবাদতের দৃঢ় সংকল্প করা: যেকোনো কাজে সফলতার পূর্বশর্ত হলো সেই বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করা আর ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য খালেছ নিয়্যতের বিকল্প নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'নিশ্চয়ই সকল কাজের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল'।[১]

(২) রামাযানের ছিয়াম ত্রুটিমুক্তভাবে পালনের খালেছ নিয়্যত করা: যেকোনো কাজের পূর্ণ ফলাফল পেতে কাজটি ত্রুটিমুক্ত হওয়া যেমন জরুরী, ঠিক তেমনি ছিয়াম পালনের মাধ্যমে জীবনের সকল গুনাহ থেকে ক্ষমা পেতে ছিয়াম ত্রুটিমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 'যে ব্যক্তি ছিয়াম রেখে মিথ্যা কথা, কাজ এবং মূর্খতা পরিত্যাগ করতে পারল না, তার ছিয়াম রেখে শুধু পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই'।[২]

(৩) রামাযান মাস আসার আগেই বেশি বেশি তওবা-ইস্তিগফার করে সম্পূর্ণভাবে গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়া: আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে পাপী বান্দাদের জন্য রামাযান মাস পাওয়া আর না পাওয়া সমান। তাই এ মাস আসার আগেই আল্লাহর কাছে খালেছ তওবা করা উচিত, যাতে রামাযান মাসটি তার জন্য কল্যাণকর হয় এবং ইবাদত-বন্দেগীতে মনোযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত তওবা-ইস্তিগফার করে গুনাহ থেকে ফিরে আসা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ 'আল্লাহ চান তোমরা তাঁর কাছে তওবা করো' *(আন-নিসা, ৪/২৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ 'হে মানবজাতি! তোমরা আল্লাহর নিকটে তওবা করো, কারণ আমি তাঁর কাছে দিনে ১০০ বার তওবা করি'।[৩] তিনি আরও বলেন, ﴿وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً﴾ 'আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ৭০ বারেরও অধিক ইস্তিগফার ও তওবা করে থাকি'।[৪] রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বাপর সব গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন; অথচ এরপরও তিনি প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ বার তওবা করেন। সুতরাং আমাদের গুনাহ থেকে আরও অধিক হারে তওবা করা প্রয়োজন।

(৪) রামাযানের প্রস্তুতি হিসেবে শা'বান মাস থেকেই ছিয়াম রাখা: মহিমান্বিত রামাযান মাসে সফলতা লাভ করতে হলে শা'বান মাস থেকেই নেক আমল আরম্ভ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শা'বান মাসে অধিক হারে ছিয়াম পালন করতেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একাধারে (এত অধিক) ছিয়াম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর ছিয়াম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশি) ছিয়াম পালন ছেড়ে দিতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) ছিয়াম পালন করবেন না। আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রামাযান ব্যতীত পূর্ণ মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোনো মাসে এত অধিক (নফল) ছিয়াম পালন করতে দেখিনি।[৫]

(৫) বিগত রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম থাকলে তা আদায় করে নেওয়া: বিভিন্ন ওযর থাকার কারণে অনেকের ছিয়াম ক্বাযা হতে পারে। নানা ব্যস্ততার কারণে যা আদায় করা হয়নি। রামাযানের পূর্বে শা'বান মাসের মধ্যেই তা আদায় করে নিতে হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ 'আমার উপর বিগত রামাযানের ছিয়াম বাকি থাকলে শা'বান মাসে ছাড়া আমি তা আদায় করতে

---

* অধ্যয়নরত, আক্বীদা ও দাওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৩।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭০২।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩০৭।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬৯, ১৯৭০।

পারতাম না’।[৬] হাফেয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর শা‘বান মাসে ক্বাযা ছিয়াম আদায়ে সচেষ্ট হওয়া থেকে বিধান গ্রহণ করা যায় যে, রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম পরবর্তী রামাযান আসার আগেই আদায় করে নিতে হবে।[৭]

(৬) রামাযানের গুরুত্ব ও ফযীলত অনুধাবন করা: আল্লাহর অশেষ রহমতের বার্তা নিয়ে রামাযান আগমন করে। ইবাদত করার পূর্বে রামাযানের গুরুত্ব ও ফযীলত অনুধাবন করতে হবে, তাহলে ইবাদতে তৃপ্তি পাওয়া যাবে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ ‘যখন রামাযান মাস আসে, তখন রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়’।[৮]

এছাড়া রামাযান অশেষ ফযীলতপূর্ণ মাস। এ মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। এ মাসেই লায়লাতুল ক্বদর রয়েছে, যা হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। এ মাসে বহু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এ মাসের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের মাধ্যমে পূর্ববর্তী গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ হয়। সুতরাং এ মাসের ফযীলতের দিকগুলো অনুধাবন করে সে অনুযায়ী পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হবে।

(৭) রামাযান সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া: রামাযান সম্পর্কিত নানা মাসআলা-মাসায়েল জেনে নেওয়া উচিত, যাতে রামাযানের ছিয়াম ত্রুটিমুক্ত হয় এবং নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্ট থেকে বাঁচা যায়। যেমন- সফরকালে ছিয়াম ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ, ভুলবশত খেলে ছিয়াম ভঙ্গ না হওয়া, গভীর ঘুমের কারণে সাহারী খেতে না পারলেও ছিয়াম শুদ্ধ হওয়া এবং স্বপ্নদোষের কারণে ছিয়াম ভঙ্গ না হওয়া ইত্যাদি মাসআলা জানা থাকলে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(৮) রামাযান মাসে কুরআন শিক্ষা ও অধিক হারে তেলাওয়াত করার পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া: রামাযান মাসে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির সংবিধান কুরআন নাযিল করেছেন। তাই এ মাসে কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং যারা পড়তে পারে না, তারা রামাযানের পূর্বেই তেলাওয়াত শিখে নিবে। যারা অল্প পারে, তারা আরও ভালো পারার জন্য পূর্ব থেকেই চর্চা শুরু করবে আর যারা ভালোভাবে পারে, তারা কুরআনের অর্থ জানা ও বুঝার চেষ্টা করবে। যারা কুরআনের অর্থ মোটামুটি জানে তাদের কুরআনের ব্যাখ্যা, তাফসীর ও গবেষণার জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। যেন প্রতিটি মুমিনের রামাযান হয় কুরআনময়। রবের কালাম নিয়েই কেটে যায় যেন বরকতপূর্ণ কুরআনের এই মাস। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ ‘রামাযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াতের ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকরণের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি হিসেবে *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*।

(৯) রামাযানের আগমনে খুশি হওয়া: রামাযান মাস পাওয়াটা একজন মুসলিমের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত। যেহেতু রামাযান কল্যাণের মৌসুম। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত এ নেয়ামত লাভের সুযোগ পেয়ে মুমিন হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ‘বলুন, আল্লাহর এই দান (কুরআন) ও তাঁর রহমতের (ইসলামের) কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। এটি তারা যা কিছু সঞ্চয় করেছে, সেসব থেকে অনেক উত্তম’ *(ইউনুস, ১০/৫৮)*। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ‘ছিয়াম পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। যখন ইফতার করে, তখন সে ইফতার করার কারণে আনন্দিত হয় আর যখন সে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তার ছওমের কারণে আনন্দিত হবে’।[৯] নেকী অর্জনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই আনন্দকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরী।

(১০) ইবাদতের জন্য রামাযানের পূর্বেই ঝামেলামুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা: প্রতিটি মানুষের কিছু না কিছু ঝামেলা বা পেরেশানি থাকে। বাড়িঘর, জায়গা-জমি, প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাসহ বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা বা ব্যস্ততা একজন মানুষের থাকতে পারে। তাই ইবাদতের সুবিধার্থে রামাযান আসার আগেই ঝামেলামুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা এবং ইবাদতের জন্য যথাসম্ভব অবসর হয়ে যাওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ ‘হে বানূ আদম! তুমি আমার ইবাদতের জন্য ঝামেলামুক্ত হও, আমি তোমার অন্তরকে সচ্ছলতা দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব’।[১০]

(১১) নাফস ও শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখার দৃঢ় সংকল্প করা: মানুষের অন্তর মন্দপ্রবণ। মন্দের প্রতি মানুষের উৎসাহ বা আগ্রহ কাজ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ ‘নিশ্চয়ই মন মন্দ কাজের নির্দেশদানকারী’ *(ইউসুফ, ১২/৫৩)*। অপরদিকে শয়তান সর্বদা

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৬।
৭. ফাতহুল বারী, ৪/১৯১।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৪।
১০. তিরমিযী, হা/২৪৬৬; ইবনু মাজাহ, হা/৪১০৭।

মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যস্ত রয়েছে। আল্লাহ শয়তানের ভাষ্য উল্লেখ করে বলেন, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ‘আপনার ইযযতের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করব’ *(ছোয়াদ, ৩৮/৮২)*। সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্তরায় হলো মানুষের নাফসে আম্মারা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা। এই মাসে যদিও শয়তান শৃঙ্খলিত থাকে, তবুও ষড়রিপুর তাড়নায় মানুষ অন্যায় ও পাপ করে বসে। অনেক সময় নিজেকে ইবাদতে মশগূল রাখতে পারে না। তাই এই বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন হয়ে তা মোকাবেলা করতে হবে।

(১২) পূর্ববর্তী রামাযানের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে দৃঢ় সংকল্প করা: রামাযানের ফযীলত লাভ করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে। ইবাদতের মাধ্যমে রামাযানে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে না পারলে তা হবে চরম ব্যর্থতা। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন,

صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً قَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً أُخْرَى فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِينَ قَالَ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِينَ فَقَالَ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ.

‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বারে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, ‘আমীন’, আরেক সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, ‘আমীন’, এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, ‘আমীন’। লোকেরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিনবার ‘আমীন’ বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, ‘আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিবরীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল, কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হলো না, আল্লাহ তাকে দূরে রাখুন। আমি বললাম, আমীন। ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিবরীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে বা তাদের একজনকে পেল; অতঃপর সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে দূরে রাখুন। আমি বললাম, আমীন। অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে আপনার কথা বলা হয়; অথচ সে আপনার উপরে দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকে দূরে রাখুন। আপনি বলুন, ‘আমীন’। আমি বললাম, ‘আমীন’।[১১] অন্যত্র তিনি বলেন,

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

‘তোমাদের কাছে বরকতময় রামাযান মাস এসেছে। মহান আল্লাহ তোমাদের উপর এ মাসের ছিয়াম ফরয করে দিয়েছেন। এ মাসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ মাসে অবাধ্য শয়তানদেরকে বন্দি করা হয়। এ মাসে আল্লাহর এমন একটি রাত আছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে অবশ্যই প্রত্যেক কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত রইল’।[১২]

সুতরাং কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না হয়ে এবং রামাযানে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে না পারার ব্যর্থতা ঘোচাতে রামাযানে সাধ্যমতো ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, তেলাওয়াতের মাধ্যমে পূর্ণ নেকীর হক্বদার হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

(১৩) আল্লাহর নিকটে তাওফীক্ব কামনা করে দু‘আ করা ও কঠোর পরিশ্রম করা: রামাযানে ছিয়াম পালন ও ফরয ছালাতসহ অধিক নফল ছালাত আদায় করার চেষ্টা করা এবং এজন্য আল্লাহর নিকটে তওফীক্ব কামনা করতে হবে। কেননা এ মাসে বেশি বেশি ছিয়াম-ক্বিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি দূরদূরান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন। তারা ছিলেন খাঁটি মুসলিম। তাদের একজন ছিলেন অপরজন অপেক্ষা শক্তিধর মুজাহিদ। তাদের মধ্যকার মুজাহিদ ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হলেন এবং অপরজন এক বছর পর মারা গেলেন। তালহা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতের দরজায় উপস্থিত এবং আমি তাদের সাথে আছি। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এসে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়েছিলেন, তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিল। সে পুনরায় বের হয়ে এসে শহীদ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিল। পরে সে আমার নিকট ফিরে এসে বলল, তুমি চলে যাও। কেননা তোমার (জান্নাতে প্রবেশের) সময় এখনও হয়নি, তোমার পালা পরে। সকালবেলা তালহা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) উক্ত ঘটনা লোকদের নিকট বর্ণনা করলেন। তারা এতে বিস্ময়াভিভূত হলেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কানে গেল এবং তারাও তাঁর কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, ‘কী কারণে তোমরা বিস্মিত হলে?’ তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এই ব্যক্তি তাদের দুজনের মধ্যে অধিকতর শক্তিধর মুজাহিদ, তাকে শহীদ করা হয়েছে; অথচ অপর লোকটি তার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করলেন! রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘অপর লোকটি কি তার পরে এক বছর জীবিত থাকেনি?’ তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘সে একটি রামাযান মাস পায়নি, ছিয়াম রাখেনি এবং এক বছর যাবৎ এই এই ছালাত কি পড়েনি?’ তারা বললেন, ‘জি, হ্যাঁ’। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘আসমান-যমীনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তাদের দুজনের মধ্যে রয়েছে তার চেয়ে অধিক ব্যবধান’।[১৩]

উপরিউক্ত ফযীলত লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক্ব

১১. ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪০৯।

১২. নাসাঈ, হা/২১০৬।

১৩. আহমাদ, হা/১৪০৪, হাদীছ ছহীহ।

ও সাহায্য চাইতে হবে। সেই সাথে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজে সফল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

(১৪) রামাযানের পূর্বেই পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ মীমাংসা করে নিতে হবে: রামাযানে মহান আল্লাহ অনেক মানুষকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যাদের মাঝে বিবাদ আছে, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যকার বিবাদ মিটিয়ে নেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, যে আল্লাহ তাআলার সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করে না আর সে ব্যক্তি এ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, যে কোনো মুসলিমের সাথে হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করে। ফেরেশতাদেরকে বলা হয় যে, এদের অবকাশ দাও, যেন তারা পরস্পর মীমাংসা করে নিতে পারে'।[১৪]

(১৫) স্ত্রী-পুত্রসহ পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে বসে রামাযানের মাসআলা-মাসায়েল আলোচনা করা এবং ছোটদেরকেও ছিয়াম পালনে উদ্বুদ্ধ করা: রামাযান মাস আসার আগেই নিজের প্রস্তুতির সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদেরকেও বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল, রামাযানের গুরুত্ব ও ফযীলত, করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে অবহিত করা আর ছোটদেরকেও ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। সম্ভব হলে ছোটদেরকে সাথে সাথে রেখে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর' *(তাহরীম, ৬৬/৬)*। ইবনু সীরীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ، وَبِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ 'যখন বাচ্চারা ডান-বাম চিনতে শিখে, তখন ছালাতের নির্দেশ দিতে হবে আর যখন ছিয়াম রাখতে (না খেয়ে থাকতে) সক্ষম হবে, তখন থেকে ছিয়াম রাখার নির্দেশ দিতে হবে'।[১৫] তাই ৯ বছর থেকে বাচ্চাদের ছিয়াম রাখার অভ্যাস করানো উচিত।

(১৬) বিগত রামাযানের অসমাপ্ত ইবাদতগুলো চিহ্নিত করা: রামাযান মাস আসার আগে বিগত রামাযানের নেক আমলগুলো করতে না পারার কারণগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। যেমন- কেন নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করা হয়নি? কেন তারাবীহ পড়া হয়নি? কেন দান-খয়রাত করা হয়নি? কেন ই'তিকাফ করা হয়নি? কেন ছায়েমকে ইফতার করানো হয়নি? কেন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামাআতের সঙ্গে আদায় করা সম্ভব হয়নি? কেন কুরআন-সুন্নাহর আলোচনায় বসা হয়নি? কেন রামাযানে পরিবারের লোকদের হক্ব আদায় করা হয়নি? কেন রামাযানে পাড়া-প্রতিবেশী বা আত্মীয়দের হক্ব আদায় করা হয়নি?

উক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করে নেওয়া প্রয়োজন। এ বছর রামাযান আসার আগে আগে চিহ্নিত কারণগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখলে কিংবা সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করলে কল্যাণকর সব নেক আমল যথাযথ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

(১৭) রামাযান মাসের চাঁদের অনুসন্ধান করা: শা'বান মাসের শেষ দিকে রহমতের মাস রামাযানের নতুন চাঁদ দেখা একটি সুন্নাত আমল। আজ এই সুন্নাত আমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছে। মাহে রামাযানকে বরণ করে নিতে চাঁদ দেখার জন্য পশ্চিম আকাশে অনুসন্ধান করা উচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, তখন বলতেন, اَللهُ اَكْبَرُ اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ الله 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়! হে আল্লাহ! আপনি এটাকে নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলাম ও সেসব আমলের তাওফীক্বের সাথে উদিত করুন, যা আপনি ভালোবাসেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, সেটাই আমাদের তাওফীক্ব দিন, আমাদের প্রভু এবং তোমার প্রভু আল্লাহ'।[১৬]

(১৮) রামাযানের আগে থেকেই বেশি বেশি দু'আ করা: রামাযানে আমলের তাওফীক্ব পাওয়ার জন্য দু'আ করা। বান্দা যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ তাওফীক্ব না দিলে কোনো ইবাদত করা সম্ভব হবে না। আবার তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ 'তোমাদের প্রভু বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব' *(আল-মুমিন, ৪০/৬০)*।

(১৯) সুস্থতার জন্য ও ব্যস্ততা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা: সুস্থতা ও অবসর সময় আল্লাহর বিশেষ দুটি নেয়ামত। যদি এই দুটি নেয়ামত না থাকে, তাহলে যতই পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করি না কেন, তা বাস্তবায়ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর কাছে এই দুটি নেয়ামতের জন্য দু'আ করতে হবে। রাসূল ﷺ বলেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ 'এমন দুটি নেয়ামত রয়েছে, যাতে অধিকাংশ লোক প্রতারিত হয়ে থাকে— একটি হচ্ছে সুস্থতা আর অপরটি হচ্ছে অবসর'।[১৭]

উপসংহার: মহান রবের কাছে ফরিয়াদ করি, হে আল্লাহ! আপনার রহমত ও ক্ষমার মাসে কত মানুষ সৌভাগ্যবানদের কাতারে নাম লেখাবে! কত মানুষ ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে! কত মানুষ জান্নাতী হয়ে যাবে! হে আল্লাহ! আমরা যেন সেই সব সৌভাগ্যবানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। আপনি আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৫।

১৫. মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা/৭৩৯০।

১৬. তিরমিযী, হা/৩৪৫১, হাদীছ ছহীহ।

১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১২।

ভালোবাসার রামাযান: ফিরে এলো তাক্বওয়ার মাস

-আব্দুল্লাহ বিন হাদী*

রাত শেষে ফিরে আসা ভোরের মতো প্রতীক্ষার প্রহর শেষে ফিরে এলো মাহে রামাযান। সর্বত্র বিরাজ করছে অন্যরকম ভালোলাগা। মুমিন হৃদয়ে বইতে শুরু করেছে বসন্তের হাওয়া। কারণ রামাযান মানে— ১১ মাসের অবাধ্যতার ইতিহাস মুছে ফেলে শুদ্ধতার পথে নতুন উদ্যমে চলতে শেখা। রামাযান মানে কালো থেকে ভালোর দিকে প্রত্যাবর্তন। রামাযান মানে আল-গাফফারের রহমে সিক্ত হওয়ার আরেকটি সুযোগ। নাজাতের সুগম পথ ও গুনাহ মাফের মোক্ষম সময় এই রামাযান মাস। এ মাসের আগমনে খুলে যাবে আসমানের বন্ধ দুয়ার। উন্মুক্ত হবে দয়াময়ের রহমের দরজা। খুলে দেওয়া হবে জান্নাতের কপাটসমূহ। মাসব্যাপী বন্ধ থাকবে জাহান্নামের দ্বার। শিকলে বন্দি থাকবে বিতাড়িত শয়তান। প্রিয় নবী ﷺ-এর অমিয় বাণী জানান দেয়— ‘যখন রামাযানের প্রথম রজনি আগমন করে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দুয়ারসমূহ বন্ধ করা হয়, ফলে কোনো দরজাই আর খোলা থাকে না। আর জান্নাতের দুয়ারগুলো খুলে দেওয়া হয়, ফলে কোনো দরজাই আর বন্ধ থাকে না। আর একজন ঘোষক ঘোষণা দিতে থাকে, হে কল্যাণকামী! তুমি অগ্রসর হও। হে অকল্যাণকামী! ক্ষান্ত দাও। আল্লাহ তাআলা এই মাসে বহু জাহান্নামীকে মুক্তি দেন। আর এটা প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে’।[১]

তাছাড়া এই মহিমান্বিত মাসেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় আল-কুরআনের শাশ্বত বাণী। হেরা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যার দ্যুতি ছড়িয়েছে তামাম দুনিয়ার মুমিন অন্তরে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ ‘রামাযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের পথনির্দেশক এবং সত্যাসত্যের পার্থক্য ও হেদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*।

শা‘বানের শেষ চাঁদ অস্তাচলে পা বাড়ালে সবার মাঝে পরিলক্ষিত হয় টানটান প্রস্তুতি। নতুন চাঁদ দেখার নিমিত্তে পাড়াগাঁয়ের শিশু-কিশোরদের মাঝেও তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।

প্রিয় পাঠক! তাক্বওয়ার মহিমায় উদ্ভাসিত হতে এবারের রামাযানকে ঘিরে আপনিও তৈরি করুন বিশেষ পরিকল্পনা।

রামাযানের সাধনা:

(১) ছিয়াম: ছুবহে ছাদিক্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একজন ব্যক্তির আল্লাহ তাআলার ভয়ে পানাহার, যৌনসম্ভোগ ও জাগতিক যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকার মাঝেই ফুটে ওঠে তাক্বওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছিয়াম ইসলামের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। রামাযানের ছিয়ামকে মুসলিমদের জন্য আবশ্যক করে রব্বুল আলামীন বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য ছিয়াম ফরয করে দেওয়া হলো, যেমনভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হতে পার’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘যে ব্যক্তি ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়’।[২]

সুতরাং মহান রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বাগ্রে ছিয়াম সাধনায় ব্রতী হোন।

(২) শুধু তাঁরই ইবাদত করা: আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকুন। তাতে শিরকের আঁচড় লাগাবেন না। এক আল্লাহর জন্য নিবেদিত হোন। ইবাদতের কোনো অংশ যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে না হয়, এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। খ্যাতির লোভ ও লৌকিকতা পরিহার করে তাঁর নির্দেশিত পন্থায় ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করুন। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ ‘কাজেই আল্লাহর ইবাদাত করুন তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে’ *(আয-যুমার, ৩৯/২)*।

(৩) কুরআনের সাথে সখ্যতা: কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি যত্নবান হোন। কুরআনের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলুন। যেহেতু এ মাসে নাযিল হয়েছে আল কুরআন। আর নবী মুছত্বফা ﷺ বলেছেন, اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ ‘তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ এটি ক্বিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য শাফাআতকারী হিসেবে আসবে’।[৩]

(৪) ত্যাগের মহিমা: ক্ষুধার পর খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। পিপাসার পর পানির মিষ্টতা অনুভূত হয়। প্রশান্তির ঘুম হয় পরিশ্রমের পর। আর প্রকৃত সফলতা অর্জিত হয় ত্যাগের বিনিময়ে। ত্যাগের জন্যই রামাযান। তাই সবসময় অন্যকে প্রাধান্য দিন। সবকিছু নিজের জন্য সাব্যস্ত করবেন না। আপনার ধনসম্পদ, খাবার-দাবার সর্বত্র আল্লাহর রাহে মানুষের জন্য বিলিয়ে দিন। ইফতার করান ছওম পালনকারীকে; সে ধনী হোক

* কুল্লিয়া ২য় বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

১. তিরমিযী, হা/৬৮২, হাদীছ ছহীহ।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০১।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৫৯।

বা দরিদ্র। পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করুন। নবী ﷺ বলেছেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ 'যে ব্যক্তি কোনো ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করায়, তার জন্যও ছিয়াম পালনকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে'।[৪]

(৫) ছাদাক্বা: রামাযান উপলক্ষ্যে আপনার দানের হাত প্রশস্ত করুন। সময়ের মর্যাদা গুণে রামাযান মাসে দানের অনন্য মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এজন্য এই মাসে আল্লাহর হাবীব ﷺ সবচেয়ে বেশি দান করতেন।

(৬) মুচকি হাসি: জাদুকরী মুচকি হাসি ভালোবাসার বায়না-সখ্যতার আগাম পত্র। মুসলিম ভাইয়ের সাথে মৃদু হেসে কথা বলার অভ্যাস করুন। দ্বিধাবোধ করবেন না। কারণ, হাদীছে এসেছে, تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ 'তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য ছাদাক্বাস্বরূপ'।[৫] তবে এই হাসি হওয়া চাই মন থেকে। হওয়া চাই স্বচ্ছ ও পবিত্র।

(৭) সুসম্পর্কের সাঁকো: আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখুন। যারা সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাদের সাথে হৃদ্যতা গড়ুন। সুসম্পর্কের সাঁকোটা দীর্ঘ করুন। মজবুত করুন পারস্পরিক বন্ধুত্বের বন্ধন। সতর্ক থাকুন যাতে আপনার দ্বারা অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। রাসূল ﷺ বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৬]

(৮) ক্ষমার মাহাত্ম্য: মানুষের প্রতি উদার হোন। যারা আপনাকে কষ্ট দেয়, আপনার অকল্যাণ চায়, এই রামাযানে চোখ বন্ধ করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তাদের ভুলভ্রান্তিগুলো দাফন করে দিন। তাদের দেওয়া কষ্টগুলো ভুলে যান। মানুষকে ক্ষমা করুন দয়াময়ের ক্ষমার অধিকারী হবেন।

(৯) অবসর: অবসরের কাছে হেরে যাবেন না। নেক আমলে পূর্ণ করুন আপনার অবসর সময়। অযথা আড্ডাবাজি, গীবত, পরচর্চায় না জড়িয়ে বই পড়ুন। আল্লাহর যিকিরে আর্দ্র রাখুন জিহ্বা। তাসবীহ-তাহলীলে কাটুক আপনার প্রতিটি সময়। ছোট ছোট আমলগুলোকে গুরুত্ব দিন। নফল আমলে এগিয়ে যান আরও একধাপ। সারাক্ষণ আপনার জবানে উচ্চারিত হোক সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি...।

(১০) ক্বিয়ামুল লায়ল: নিঝুম রজনিতে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে সমস্ত বিশ্ব চরাচর। নিঃশব্দের ঢেউ খেলে যায় প্রকৃতির বুকে। নীরবতার ছায়া নেমে আসে পৃথিবীর আঙিনায়। এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাতেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ। আলাপ জুড়তেন রবের সাথে। দাঁড়াতেন রাতের মুছল্লায়। দীর্ঘক্ষণ ক্বিয়ামের ফলে পা দুটো ফুলে যেত। তিনি বলেন, وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ 'ফরয ছালাতের পর সর্বোত্তম ছালাত হচ্ছে রাতের ছালাত'।[৭]

তিনি রামাযানের ব্যাপারে বলেছেন আরও একটি চমৎকার কথা, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাতে ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[৮]

তাই আপনিও শামিল হোন রাতের ছালাতে। আবেগে-অনুরাগে সিক্ত করুন আঁখিদ্বয়।

নিষিদ্ধ সীমারেখা: বাড়াব না পা

পবিত্র রামাযানের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে একজন মুমিনের আল-কুরআন ও ছহীহ সুন্নায় বর্ণিত সকল গর্হিত কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং-

(১) এই মহিমান্বিত মাসে কোনো প্রকার পাপ-পঙ্কিলতার পথে ধাবিত হবেন না।

(২) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না।

(৩) হাত, পা, মুখ ও অন্তরকে পঙ্কিলতা মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হোন।

(৪) পরনিন্দা ও গীবত থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকুন। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ 'দুর্ভোগ প্রত্যেক পিছনে ও সামনে নিন্দাকারীর জন্য' *(আল-হুমাযাহ, ১০৪/১)*।

আর একজন মুমিনের জন্য নিজের জবানকে হেফাযত করা অতীব জরুরী। যেমন-

(১) অশ্লীল অনুষ্ঠান, সিনেমা, ম্যাগাজিন, বই ও ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

(২) ইফতার ও সাহরীতে খাবার বিনষ্ট করা ও অপচয় রোধ করুন।

(৩) ছালাত ও অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা ঝেড়ে ফেলুন।

(৪) ঠকবাজি, প্রতারণা, খেয়ানত, ঝগড়া-বিবাদ ও গালিগালাজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করুন।

(৫) মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করুন। মিথ্যাকে ছোট করে দেখবেন না, প্রশ্রয় দিবেন না। সেটা ইচ্ছে করে হোক বা ঠাট্টার ছলে। বিশ্ব নবী ﷺ-এর ফরমান বলে, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই'।[৯]

সর্বোপরি, এই রামাযানে তাক্বওয়ার মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে বিশ্বাসী চেতনা ও শুদ্ধাচারী প্রেরণায় উজ্জীবিত হোক প্রতিটি হৃদয়। আবার ফিরে আসুক পঙ্কিলতাহীন পবিত্রতার আবেশ জড়ানো অনাবিল স্নিগ্ধতার জোয়ার। আমলের দিনগুলো ফুরিয়ে যাবার আগেই ঝরে যাক কদর্যতার রেশ। সবশেষে রবের কাছে এই প্রত্যাশা। আল্লাহ কবুল করুন- আমীন!

৪. তিরমিযী, হা/৮০৭, হাদীছ ছহীহ।
৫. তিরমিযী, হা/১৯৫৬, হাদীছ ছহীহ।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৪।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৫।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৩৭।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৩।

রামাযানে বেশি বেশি দান ও কুরআন তেলাওয়াত

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

রামাযান মাস দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে অধিক ছওয়াব অর্জনের মাস। রামাযান দয়া ও করুণার মাস। এ মাসে ছিয়াম পালনকারী না খেয়ে থাকার মাধ্যমে অভাবী মানুষের প্রতিদিনের দুঃখগুলো অনুভব করতে পারেন। মাহে রামাযান মানুষকে দানশীলতা, বদান্যতা, উদারতা ও মাহাত্ম্যের শিক্ষা দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবকুলের মধ্যে সর্বাধিক উদার ও দানশীল ছিলেন। রামাযানের অন্যতম আমল হলো দান-ছাদাক্বা। তাই ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তিকে ইবাদতে মগ্ন থেকে সহানুভূতি, সদয় আচরণ, দানশীলতা ও বদান্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। দানশীলতা ও বদান্যতা একটি মহৎ গুণ। ইসলাম যেমন দানশীলতাকে উৎসাহিত করেছে, তেমনি পরনির্ভরশীল হওয়াকে নিরুৎসাহিত করেছে। রামাযানে ছিয়াম পালনকারীগণ ছিয়াম পালনের মাধ্যমে দানশীল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ হন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ ধনসম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। রামাযানে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরও অধিক দান করতেন। রামাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন আর নবী ﷺ তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক দানশীল হতেন'।[১]

রামাযান মাসে তিনি ও জিবরীল (আলাইহিস সালাম) মিলিত হতেন আর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ফেরেশতা। তারা উভয়ে মিলে নাযিলকৃত কুরআন পরস্পরকে পড়ে শুনাতেন। কুরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম কিতাব, যা ইহসান ও উত্তম আখলাকের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রেরিত করে আর এ সম্মানিত কিতাবই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র। যেহেতু এ কিতাব সেসব বিষয়ে উৎসাহিত করেছে, তিনি যেসব কাজ করতে দ্রুত এগিয়ে আসতেন এবং যা কিছু থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন, তিনিও তা থেকে বিরত থাকতেন। এ মাসে তাঁর দান-খয়রাত ও দয়া বহুগুণে বৃদ্ধি পেত, যখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে রামাযানে সাক্ষাৎ করতেন ও পরস্পরকে বেশি বেশি কুরআন পড়ে শুনাতেন।

আলোচ্য হাদীছে মূলত দুটি বিষয় ফুটে উঠেছে— ১. রামাযান মাসে রাসূল ﷺ-এর বেশি বেশি দান এবং ২. এ মাসে বেশি বেশি কুরআন পড়া।

এর কারণ হলো, রামাযান মাসে সৎকাজ করলে অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেকগুণ ছওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা রামাযান মাসের রয়েছে নিজস্ব সম্মান ও মর্যাদা, যা অন্যান্য মাসের নেই। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ 'আদম সন্তানের প্রতিটি কাজের ছওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তবে ছিয়াম ব্যতীত। কেননা তা শুধু আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার দিব'।[২] অন্য হাদীছে, আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বনী আদম এর প্রতিটি ছওয়াবকে ১০ গুণ থেকে ৭০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ছিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, এটি বিশেষ করে আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দুটি খুশি রয়েছে। একটি খুশি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ মহান আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও বেশি পছন্দনীয়; ছওম ঢালস্বরূপ, ছওম ঢালস্বরূপ'।[৩]

রামাযান মাসে বেশি বেশি দান করা: রামাযানকে দানের মাস হিসেবে গ্রহণ করতে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা রয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন রামাযান মাসে দান ও বদান্যতার হাত সম্প্রসারিত করতে। হাদীছেও রামাযান মাসকে 'সহানুভূতির মাস' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মাহে রামাযানে ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে ছিয়াম পালনকারীর অন্তরে দানশীলতা ও বদান্যতার গুণাবলি সৃষ্টি হয়।

রামাযানের অন্যতম আমল হলো দান-ছাদাক্বা। তাই ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তিকে ইবাদতে মগ্ন থেকে সহানুভূতি, সদয় আচরণ, দানশীলতা ও বদান্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

দানশীলতা ও বদান্যতা মহৎ গুণ। ইসলাম যেমন দানশীলতাকে উৎসাহিত করেছে, তেমনি পরনির্ভরশীল হওয়াকে নিরুৎসাহিত করেছে। রামাযানে ছিয়াম পালনকারীগণ ছিয়াম পালনের মাধ্যমে দানশীল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ হন। আল্লাহ তাআলা দান-ছাদাক্বা সম্পর্কে বলেন, ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ - وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ 'আমি তোমাদেরকে যে রিযিক

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০২।

২. ইবনু মাজাহ, হা/৩৮২৩, হাদীছ ছহীহ।

৩. মুসনাদে আহমাদ, ১/৪৪৬; আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৩/১৭৯।

দিয়েছি, তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; (অন্যথা মৃত্যু আসলে) সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য কেন অবকাশ দিলে না, তবে আমি ছাদাক্বা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকেও অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত' *(আল-মুনাফিকূন, ৬৩/১০-১১)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ 'যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন' *(আলে ইমরান, ৩/১৩৪)*।

রহমতের মাস রামাযানে প্রত্যেকের জন্য বরকতময় আমল হলো নিজেদের সবচেয়ে বেশি প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ 'তোমরা কখনও নেকী পাবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে খরচ করো। আর তোমরা যা কিছুই দান করো, আল্লাহ তা জানেন' *(আলে ইমরান, ৩/৯২)*। এই আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন ছাহাবীগণ কীভাবে উত্তম বস্তু দান করতে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন, তা এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, মদীনার আনছারগণের মধ্যে আবূ তালহা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ছিলেন অন্যতম ধনী ব্যক্তি। তার সবচেয়ে বেশি খেজুরগাছ ছিল। সমস্ত বাগানের মধ্যে 'বায়রহা' নামক বাগানটি ছিল তার (আবূ তালহা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর) অধিক পছন্দনীয়। বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই বাগানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। সেখানকার মিষ্টি পানি পান করতেন। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয়, ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ অর্থাৎ 'যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ না করবে, ততক্ষণ তোমরা নেকীর অধিকারী হবে না'। তখন আবূ তালহা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ না করবে, ততক্ষণ তোমরা ছওয়াবের অধিকারী হবে না আর আমার প্রিয় বস্তু হলো এই 'বায়রহা'। আমি এটা আল্লাহর রাস্তায় ছাদাক্বা করলাম। এর বিনিময়ে আমি নেকীর আশা রাখি এবং এটা আল্লাহর নিকট জমা রাখছি। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি এটাকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'বাহবা! এটা অত্যন্ত লাভজনক মাল, এটা অত্যন্ত লাভজনক মাল। তুমি এই বাগান সম্বন্ধে যা কিছু বলেছ, আমি তা শুনেছি। আমার মনে হয়, তুমি এই বাগান তোমার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করে দাও'। আবূ তালহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি তা বিতরণ করে দিব। অতএব, আবূ তালহা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তার আত্মীয়স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন।[৪] আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ 'যারা আল্লাহর পথে তাদের মাল খরচ করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি শস্যদানা যা সাতটি শিষ উৎপন্ন করে। প্রত্যেক শিষে ১০০ শস্যদানা থাকে আর আল্লাহ যাকে চান তাকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রশস্তকারী, মহাজ্ঞানী' *(আল-বাক্বারা, ২/২৬১)*।

দানের ফযীলত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, ইয়ায ইবনু গুতাইফ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাকে দেখতে যাই। তার স্ত্রী শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আবূ উবায়দা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর রাত কীরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বলেন, রাত অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। সেই সময় তার মুখমণ্ডল দেয়ালের দিকে ছিল। এই কথা শোনামাত্রই তিনি জনগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, আমার এ রাত কঠিন অবস্থায় কাটেনি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের উদ্বৃত্ত জিনিস মহান আল্লাহর পথে দান করে, সে ৭০০ পুণ্যের অধিকারী হয় আর যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য খরচ করে, অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়, অথবা কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করে, তবে ভালো কর্মের প্রতিদান ১০ গুণ হবে। ছওম হচ্ছে ঢালস্বরূপ যে পর্যন্ত না তা নষ্ট করা হয়। যে ব্যক্তি শারীরিক বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা ও রোগে আক্রান্ত হয়, ঐগুলো তার পাপসমূহ ঝেড়ে ফেলে'।[৫] আবূ মাসঊদ আনছারী বলেন, এক ব্যক্তি লাগামসহ একটি সুসজ্জিত উট নিয়ে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এটি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'ক্বিয়ামত দিবসে তুমি এ জন্য ৭০০ উট প্রাপ্ত হবে'।[৬]

দান-ছাদাক্বা গুনাহ মাফ করে ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 'খেজুরের একটি অংশ দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো'।[৭] ছওম ও ছাদাক্বা একত্রিত হলে জান্নাত পাওয়া অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভিতর পরিদৃষ্ট হবে'। তখন এক বেদুঈন উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এটি কার হবে? তিনি বললেন, 'এটি হবে তার, যে ভালো কথা বলে, অন্যকে খাদ্য খাওয়ায়, সর্বদা ছওম পালন করে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে

৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/১৮৭৩।
৫. মুসনাদে আহমাদ, ১/১৯৫, ১৯৬; আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/৩০০।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৯২; নাসাঈ, হা/৩১৮৭; দারেমী, হা/২৪০২।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৪১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৬।

থাকে, তখন সে ছালাত আদায় করে’।[৮]

রামাযানে যাকাত ফরয না হলে বেশি করে ছাদাক্বা করা: যাদের ওপর যাকাত ফরয নয়, তারা এই মাসে বেশি বেশি ছাদাক্বা করতে পারেন। যাদের ওপর যাকাত ফরয, তারাও যাকাত আদায়ের পর অতিরিক্ত ছাদাক্বা করতে পারেন। ছাদাক্বার মাধ্যমে মহান আল্লাহ রিযিক্বে বরকত দেন, বিপদাপদ দূর করে দেন, মানুষের হায়াতে বরকত হয়, অপমৃত্যু কমে এবং অহংকার ও অহমিকা থেকে মুক্ত থাকা যায়।[৯]

রামাযানে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা: রামাযান মাসে আমরা কুরআন বেশি বেশি তেলাওয়াত করব। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ ‘কুরআনে দক্ষ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সম্মানিত পুণ্যবান ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন। যে ব্যক্তি কুরআন আটকে আটকে তেলাওয়াত করে এবং তা তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে’।[১০]

দুটি প্রতিদানের প্রথমটি হলো তেলাওয়াতের এবং দ্বিতীয়টি হলো পাঠকারীর কষ্টের কারণে।

অনুরূপভাবে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْاُتْرُجَّةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ‘যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত জামিরের (লেবু জাতীয় ফল) মতো, যার ঘ্রাণ সুন্দর আর স্বাদও সুন্দর। আর যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায়, যার কোনো ঘ্রাণ নেই; কিন্তু তার স্বাদ মিষ্টি’।[১১] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীছে, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন আল্লাহর কোনো ঘরে (মসজিদে) লোকজন একত্রিত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে এবং নিজেদের মাঝে তা অধ্যয়ন করে; তখন তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে, ফেরেশতাগণ তাদের বেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহ তাদের কথা তাঁর কাছে অবস্থিত ফেরেশতাদের কাছে আলোচনা করেন’।[১২]

কুরআন তেলাওয়াতে প্রতিটি হরফে নেকী রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ، وَلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ ‘যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ (অক্ষর) পাঠ করবে, তাকে একটি নেকী প্রদান করা হবে আর প্রতিটি নেকী ১০ গুণ বৃদ্ধি করা হবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ’।[১৩]

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদকে রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ ‘আর নিশ্চিত এটা (কুরআন) মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত’ *(আন-নামল, ২৭/৭৭)*। অন্য স্থানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ﴿هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ﴾ ‘(এই কুরআন) হেদায়াত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য’ *(লুক্বমান, ৩১/৩)*।

প্রত্যেক মানুষ এই পৃথিবীতে সম্মান, আত্মতৃপ্তি ও ভালো অবস্থা নিয়ে জীবনযাপন করার জন্য আল্লাহ তাআলার রহমতের মুখাপেক্ষী। এই পৃথিবী ত্যাগ করার পর আলামে বারযাখের (কবরের) জিন্দেগীতেও প্রত্যেক মানুষ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আরামদায়ক ঘুমের জন্য আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। কবরের জীবনের পর ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতপ্রাপ্তির জন্যও প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। পৃথিবী, কবর, পরকাল এই তিনটি স্থানে আমরা সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। আমরা কদমে কদমে ঐ রহমতের মুখাপেক্ষী। আসুন! গভীরভাবে চিন্তা করি, কুরআন মাজীদ কীভাবে পৃথিবী, কবর এবং পরকালে আমাদের জন্য রহমত। কুরআনের আয়াত শ্রবণে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ‘নিশ্চয় মুমিনরা এইরূপ হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন ঐ আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয় আর তারা নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে’ *(আল-আনফাল, ৮/২)*।

ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর হাদীছে এসেছে, أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ العَامَ مَرَّتَيْنِ ‘জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রতি বছর আমাকে একবার কুরআন পড়ে শুনাতেন। এবছর তিনি তা আমাকে দুবার পড়ে শুনিয়েছেন’।[১৪]

অতএব, রামাযানে আমরা বেশি করে ছাদাক্বা করব এবং রাতের বেলায় বেশি পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করব। কেননা রাতের বেলায় মানুষ ঝামেলামুক্ত থাকে, সমস্ত হিম্মত একত্রিত হয়, অন্তর ও যবান চিন্তা-গবেষণার জন্য একনিষ্ঠ হয়।

---

৮. তিরমিযী, হা/১৯৮৪, হাসান।
৯. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৬৫।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৯৮।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪২৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৩।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯; আবূ দাঊদ, হা/১৪৫৫।
১৩. তিরমিযী, হা/২৯১০, হাদীছ ছহীহ।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৫০।

ক্বিয়ামুল লায়ল আদায়ের সহজ উপায়

-মো. মাযহারুল ইসলাম*

ইসলামী শরীআতে ফরয ইবাদতের পাশাপাশি কিছু নফল ইবাদত রয়েছে। এসব ইবাদত অনেক ফযীলতপূর্ণ। নফল ইবাদত যতই ছোট হোক না কেন, এগুলো নিয়মিত আদায় করলে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ এসব নফল ইবাদতের অসীলায় আমাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। তেমনই একটি নফল ইবাদত হলো ক্বিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদ ছালাত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের সহজ কিছু উপায় নিয়ে আলোচনা করব।

(১) আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়া: একজন মুসলিমের জীবনে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ব্যতীত সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ছাড়া মুসলিমের জীবন চলা অসম্ভব। তাঁর সাহায্য আবশ্যক। বিশেষ করে ক্বিয়ামুল লায়ল এর ক্ষেত্রে। কেননা এই ছালাত আদায় করতে দিবে না বলে শয়তান বান্দাকে ঘুমের মধ্যে তিনটি গিঁট দেয়। যদি বান্দা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে ঘুমিয়ে যায়, তাহলে তার উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে অপারগ হয়।

ফলে বান্দা তার রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গভীর রাতে তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তাহাজ্জুদ ছালাতের লক্ষ্যে উঠতে সক্ষম হয়। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াই চিরশত্রু শয়তানকে পরাস্ত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ‘নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে, তাদের উপর তার কোনো আধিপত্য নেই’ *(আন-নাহল, ১৬/৯৯)*।

(২) আল্লাহকে ভালোবাসা ও তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখা: বান্দার জন্য মা‘বূদ আল্লাহকে ভালোবাসা খুবই জরুরী। যে যত বেশি আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং ছালাতের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করবে, সে তত বেশি আল্লাহর প্রিয়ভাজন বান্দাতে পরিণত হবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন যখন ছালাতের মাধ্যমে হবে, তখন সে আল্লাহর বেলায়েত লাভ করবে তথা ওলী হতে পারবে। আল্লাহ তাঁর রহমতের চাদরে তাকে আবৃত করে নিবেন। আল্লাহ তাকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন। তাছাড়া ইবাদতের রুকন তিনটির মধ্যে একটি হলো আল্লাহকে ভালোবাসা। আল্লাহকে না ভালোবাসা পর্যন্ত যে কারো পক্ষে মুসলিম ও মুমিন হওয়া অসম্ভব। এজন্য মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সুধারণা রাখতে হবে; নচেৎ আল্লাহর ব্যাপারে যেমন ধারণা পোষণ করবে, বান্দার ফলাফল তেমনই হবে যেমনটি সে ধারণা করেছে। এখানে সম্পর্ক কিংবা ভালোবাসার মানদণ্ড হলো আল্লাহর জন্য। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং তাঁর জন্যই কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো আক্বীদার অন্যতম একটি অধ্যায়। এজন্য আমরা বলি আল্লাহকে ভালোবাসা এবং তাঁর সাথে যত বেশি সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, সেটা ততই বান্দার জন্য কল্যাণকর। যে আল্লাহকে ভালোবেসে তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করবে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসেন। আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। এজন্য আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে শরীক হওয়া এবং যাবতীয় অবাধ্যতামূলক কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর মধ্যেই বান্দার জন্য বড় সফলতা নিহিত রয়েছে।

(৩) ক্বিয়ামুল লায়লের ফযীলত সম্পর্কে জানা: ক্বিয়ামুল লায়লের ফযীলত প্রায় সকলের জানা। আসমানের নিচে ও যমীনের উপরে ফরয ছালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ছালাত হলো তাহাজ্জুদ ছালাত তথা রাতের ছালাত। তাহাজ্জুদ আদায়কারী মহান আল্লাহর কাছে প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অন্যতম। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও পরকালে অগণিত কল্যাণ, সৌভাগ্য, সুখ ও শান্তি। তাদের প্রতিদান কেবল জান্নাত। তাদের সমতুল্য কেউ নেই, কিন্তু এটা তারা জানে না। তারা ঈমানের স্বীকৃতি দেয় তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের মাধ্যমে। অথচ সেই ইবাদত আদায় করা খুব সহজ কাজ নয়। নিঃসন্দেহে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা জান্নাতে প্রবেশের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ। এই ছালাত আদায়ের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধি করেন। তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা হলো আল্লাহর সৎ, পরহেজগার বান্দাদের চিরাচরিত অভ্যাস। অতএব, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় একজন বান্দার প্রকৃত মর্যাদা লুক্কায়িত আছে তাহাজ্জুদের মধ্যে।

* দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা; শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

(৪) শয়তানের কৌশল জানা এবং তা আদায়ে বাধা প্রদানের বিষয়ে জানা: শয়তান বরাবরই মানুষকে যে কোনো ইবাদত কিংবা সৎ কাজ করতে নিরুৎসাহিত করবে, করতে দিবে না বলে সে মানুষের রক্তের শিরা-উপশিরায় ছুটে বেড়ায়। উদ্দেশ্য হলো, সে মানুষকে ইবাদত করতে দিবে না অথবা তার জন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে কিংবা তাকে উদাসীন করবে। এজন্য শয়তানের কৌশল ও প্ররোচনা জানা জরুরী। শয়তান যে পথেই তাকে প্ররোচিত করতে চায় না কেন, তাকে পরাস্ত করার জন্য পথ ও পন্থা অবলম্বন করা একজন মুমিনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদিন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একজন লোকের কথা উল্লেখ করা হলো, যে রাতে ঘুমিয়েছে সকাল পর্যন্ত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘ঐ লোকের কানে শয়তান পেশাব করেছিল’ অথবা তিনি বলেছেন, ‘তার দুই কানে’।[১] ছাহাবী আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ ঘুমায়, তখন শয়তান তার মাথার পশ্চাৎভাগে তিনটা গিঁট বেঁধে দেয় এবং শয়তান প্রত্যেক গিঁট বাঁধে এই বলে, ঘুমাও! রাত অনেক লম্বা আছে। অতঃপর যদি ঐ ব্যক্তি জাগ্রত হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে একটা গিঁট খুলে যায়। অতঃপর যখন সে ওযূ করে, তখন আরেকটা গিঁট খুলে যায়। অতঃপর সর্বশেষ যখন সে ছালাত আদায় করে, তখন শেষ গিঁট খুলে যায়। ফলে ঐ ব্যক্তি একটি উৎফুল্ল সতেজ হৃদয়ের অধিকারী হয়, নচেৎ মন্দ অলসতার সকাল করে (যে ঘুম থেকে উঠে না)’।[২] ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল ‘আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, ‘হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে একদিন রাতে ওঠে, অতঃপর রাতের ছালাত পরিত্যাগ করেছে।’।[৩] ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা একদিন একটা স্বপ্ন দেখেন, অতঃপর তা বর্ণনা করেন উম্মুল মুমিনীন হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর কাছে (তাঁর বোন)। অতঃপর হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা এই ঘটনা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বর্ণনা করেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কতই না উত্তম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ! যদি সে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করত’। একথা শুনার পর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা রাতে খুব কমই ঘুমাতেন।[৪]

(৫) কম আশা-আকাঙ্ক্ষা করা এবং বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা: কম আশা-আকাঙ্ক্ষা করা এবং মৃত্যুর কথা বেশি স্মরণ করা আমল করতে বাধ্য করে এবং সকল প্রকার অলসতা বিতাড়িত করে। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, একদিন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধ ধরলেন এবং বললেন, ‘তুমি দুনিয়াতে বসবাস করো যেন তুমি বান্ধবহীন প্রবাসী অথবা মুসাফির’। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা প্রায় বলতেন, যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন সকালের অপেক্ষা করবে না এবং যখন তুমি সকালে উপনীত হবে, তখন তুমি সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করবে না। অসুস্থতার জন্য সুস্থতাকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করো এবং মৃত্যুর জন্য জীবনকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করো।[৫] এজন্য কতিপয় পরহেযগার ব্যক্তি বলেন, আমি আশ্চর্য হই ঐ ব্যক্তিকে দেখে, যার দেহ সুস্থ এবং সেই যুবক ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়েছে; অথচ মৃত্যু থেকে সে নিরাপদ হয়নি।

(৬) সুস্থতা ও অবসর সময়কে গুরুত্ব দেওয়া: তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের জন্য শারীরিক সুস্থতা ও সকল কর্ম, পেরেশানি, ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হওয়া জরুরী। শারীরিক সুস্থতা ও অবসর সময়কে একজন মুসলিম ও মুমিনের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত ও মহামূল্যবান সম্পদতুল্য। তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের জন্য শারীরিক সুস্থতা ও অবসর সময় সবচেয়ে বেশি উপযোগী মাধ্যম। এই আমলের যদি ধারাবাহিকতা থাকে, তাহলে সে অসুস্থ অবস্থায়ও সুস্থ থাকার সময় যে নিয়মিত আমল করত, তার ছওয়াবের অধিকারী হবে। ছাহাবী আবূ মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন কোনো বান্দা অসুস্থ হয় অথবা কোনো সফর করে, তাহলে তার আমলনামায় অনুরূপ ছওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়, সুস্থ থাকাবস্থায় সে যেমন আমল করত, সেইরূপ আমলের ছওয়াব’।[৬]

অতএব, কোনো বিবেকবান মানুষের উচিত নয় এই মহামূল্যবান সময়কে নষ্ট করা; বরং তার সময়কে যথার্থ মূল্যায়ন ও কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। এজন্য শারীরিক সুস্থতায় ও অবসর সময়ে আল্লাহর ইবাদতে কাটানো এবং আমলে ছালেহ সম্পাদন করার কাজে বান্দা যেন প্রচেষ্টা

১. ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭৪।
২. ছহীহ বুখারী, হা/১১৪২; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭৬।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/১১৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/১১২১, ১১২২।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১৬।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৯৬।

অব্যাহত রাখে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ‘অধিকাংশ মানুষ দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে ধোঁকাগ্রস্ত— শারীরিক সুস্থতা ও অবসর সময়’।[৭] ছাহাবী ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একজন ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, ‘তোমরা পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের উপর প্রাধান্য দিবে— ১. যৌবনকালকে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে মূল্যায়ন করবে, ২. অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে মূল্যায়ন করবে, ৩. দারিদ্র্য আসার আগেই সচ্ছলতাকে মূল্যায়ন করবে, ৪. ব্যস্ততা আসার আগেই অবসর সময়কে মূল্যায়ন করবে এবং ৫. মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনকে মূল্যায়ন করবে’।[৮]

(৭) তাড়াতাড়ি ঘুমানোর ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া: ফজরের ছালাত এবং তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী, প্রফুল্ল, ফুরফুরে মেজাজ তৈরি করতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর কোনো বিকল্প নেই। সম্ভবপর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাওয়া তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের একটি সহজ মাধ্যম। ছাহাবী আবূ বারযাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল ﷺ এশার পূর্বে ঘুমানো এবং এশার পর গল্পগুজব করা অপছন্দ করতেন।[৯] ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈগণের মধ্যে এশার পর কথা বলার ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। তাদের মধ্যে একদল এশার পর খোশগল্প করাকে অপছন্দ করেছেন। আরেকদল এশার পর ইলমী আলোচনার ক্ষেত্রে এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছেন ।[১০]

(৮) ঘুমানোর আদবের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া: একজন তাহাজ্জুদ আদায়কারী ব্যক্তি ঘুমানোর আদব তথা নিয়মনীতি অনুসরণ করবেন। পবিত্র শরীরে ওযূ করবে, কুরআন-হাদীছে বর্ণিত দু‘আসমূহ পাঠ করবে। অতঃপর ঘুমানোর দু‘আ পাঠ করে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীর মাসাহ করবে। মাসাহ করার নিয়ম হলো, মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু মাসাহ করবে। এমনটা তিনবার করবে। অতঃপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে এবং সেই সাথে সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত পাঠ করবে। অতঃপর ঘুমানোর দু‘আসমূহ পাঠ করে ঘুমাবে।

ঘুমানোর আদব রক্ষা করে কোনো ব্যক্তি যদি ঘুমায়, তাহলে সে যেমনভাবে ইবাদতের ছওয়াব পেলেন, ঠিক তেমনি তিনি সুন্নাহ অনুসরণ করলেন।

(৯) যাবতীয় পাপ ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করা: যাবতীয় অবাধ্যতা এবং পাপ বর্জন না করা পর্যন্ত বান্দা আল্লাহর নিকটে প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। পাপ ও অবাধ্যতা বর্জন করার মাধ্যমে বান্দা যাবতীয় কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং সে তার যাবতীয় কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত করতে পারবে। সেই সাথে আল্লাহর কাছাকাছি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। এজন্য পাপ বর্জন এবং যাবতীয় অবাধ্যতা বর্জন একজন বান্দার জন্য খুবই জরুরী। ইমাম হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হে আদম সন্তান! যাবতীয় ভুল তথা পাপ ছেড়ে দাও, তাহলে তোমার জন্য অধিক সহজ হবে তওবা করা। মুহাম্মাদ ইবনে কা‘ব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি, যে সকল প্রকার পাপকে বর্জন করে।[১১] হুযায়ফা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যখন বান্দা কোনো পাপ করে, তখন তার ক্বলবে একটি কালো দাগ পড়ে। এমনকি এই কালো দাগ তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যায়। এজন্য সালাফগণ বলেন, অবাধ্যতা ও পাপ হলো কুফরীর পোস্ট অফিস।[১২]

পরিশেষে বলা যায়, তাহাজ্জুদ ছালাত আমাদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাতে পরিণত করতে সাহায্য করবে। তাই আমাদের উচিত তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নফল ইবাদত আদায়ের চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল ইবাদত পালন সহজতর করুন এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১২।
৮. আল-জামে‘ আছ-ছগীর, হা/১০৮৮।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪১।
১০. ইমাম নববী, আল আযকার, পৃ. ৫৩৩।
১১. আইয়ুহাল মুযনিব বি‘সা মাখতারতা, পৃ. ৮।
১২. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাজার আল-মাক্কী, আল-জাওয়াযের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের, পৃ. ১২৮।

ছিয়াম ও তাক্বওয়ার সমীকরণ

*-মেরাজুল ইসলাম প্রিয়**

রামাযান মাসে ছিয়াম সাধনার কিংবা ফরয হওয়ার বিশেষ একটি উপলক্ষ্য আছে। উপলক্ষ্যটি মহান আল্লাহ নিজেই তাঁর কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ 'রামাযান হলো সেই মাস, যাতে নাযিল হয়েছে আল-কুরআন, মানুষের জন্য হেদায়াত, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকরণ ও হেদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এই মাসটি পাবে, সে যেন এই মাসে ছিয়াম পালন করে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। এখানে রামাযানকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে কুরআন নাযিলের মাস হিসেবে, আবার সেই কুরআনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে হেদায়াত ও ফুরক্বান তথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে, আবার তাক্বওয়াকে ভালোভাবে রপ্ত করতে ছিয়াম ফরয করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর; যেন তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পারো' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

এবার আসুন, একটি সমীকরণ মেলানোর চেষ্টা করি—

সমীকরণ-১: কুরআন নাযিল করা হয়েছে রামাযান মাসে হেদায়াত ও ফুরক্বান হিসেবে। একে উপলক্ষ্য করে ফরয করা হয়েছে ছিয়াম।

সমীকরণ-২: ছিয়াম ফরয করার উদ্দেশ্য হলো তাক্বওয়া অর্জন।

প্রশ্ন হলো এই সমীকরণের সমাধান কীভাবে হতে পারে?

এর সমাধান হতে পারে নিচের আয়াতটিকে গভীরভাবে ধারণ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾। 'আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটা যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে, তারা এর প্রতি ঈমান আনে। আর যারা এর প্রতি কুফরী করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত' *(আল-বাক্বারা, ২/১২১)*। তথা আয়াতে উল্লিখিত যথাযথ তেলাওয়াতকারীই হলো সেই ব্যক্তি, যার পক্ষে এই সমীকরণকে সহজভাবে মিলানো সম্ভব! তাহলে এই 'যথাযথ তেলাওয়াত করে' কিংবা حَقَّ تِلَاوَتِهِ শব্দ দ্বারা কুরআন কী বুঝিয়েছে? এর একটি অর্থ সম্পর্কে উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, هُمُ الَّذِينَ إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلُوهَا مِنَ اللَّهِ، وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَعَاذُوا مِنْهَا 'যারা রহমত সংবলিত কোনো আয়াত দেখতে পেলে আল্লাহর কাছে তাঁর রহমত প্রার্থনা করে আর যখন আযাব সম্পর্কিত কোনো আয়াত সামনে আসে, তখন সেই আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়।'[1]

হাসান বাছরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, هُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمُحْكَمِهِ، وَيُؤْمِنُونَ بِمُتَشَابِهِهِ، وَيَكِلُونَ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ إِلَى عَالِمِهِ 'এরা তো তারাই, যারা মুহকামাত বিষয়গুলোর উপর আমল করে, মুতাশাবিহাত বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের কাছে যা জটিল মনে হয়, তা আলেমদের দিকে সোপর্দ করে'।[2]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أَنْ يُحِلَّ حَلَالَهُ وَيُحَرِّمَ حَرَامَهُ، وَيَقْرَأَهُ كَمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ، وَلَا يُحَرِّفَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَا يَتَأَوَّلَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! নিশ্চয়ই 'যথাযথ তেলাওয়াত' এর অর্থ হলো এর হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করা, হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করা, আল্লাহ যেভাবে নাযিল করেছেন, সেভাবে এর তেলাওয়াত করা, কোনো রকম বিকৃতি সাধন না করা, যা তার ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন কোনো ব্যাখ্যা বা তাফসীর না করা।'[3]

সুতরাং উপরিউক্ত সমীকরণ দুটির ফলাফল দাঁড়াল—

(১) রামাযানের গুরুত্ব বুঝতে হলে আপনাকে কুরআনের গুরুত্ব বুঝতে হবে এবং পুরো রামাযান মাসে সেই গুরুত্বকে অর্থবহ করতে আপনাকে ছিয়াম পালন করতে হবে।

(২) ছিয়ামের মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জন কেবল তখনই সাধিত হতে পারে, যখন কুরআনের সাথে আপনার যাপিত জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য এবং সুগভীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। হোক তা তেলাওয়াত কিংবা বুঝার ক্ষেত্রে, হোক তা আপনার বিশ্বাস কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে, হোক জীবনঘনিষ্ঠ কোনো বিষয়ে তথা সকল বিষয়ে।

মনে রাখবেন, তাক্বওয়া কোনো চাট্টিখানি বিষয় নয়; বরং মহান আল্লাহর কাছে বান্দার মর্যাদার মানদণ্ড হলো তাক্বওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাক্বওয়ার অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সবকিছুর খবর রাখেন' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*।

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে ও তাক্বওয়ার সাথে ছিয়াম পালন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

* ধলপুর লিচুবাগান জামে মসজিদ গেইট, বউ বাজার, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

১. তাফসীরে কুরতুবী, ২/৮৬।
২. তাফসীরে কুরতুবী, ২/৮৬।
৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/৪০৩।

যাকাতের বিধান

-মাহবুবুর রহমান মাদানী*

‘যাকাত’ শব্দের অর্থ হলো- বৃদ্ধি করা, পবিত্র করা। আর যাকাতের পারিভাষিক অর্থ হলো, ‘ইসলামী শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ মালের নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে’। কুরআন মাজীদের সর্বমোট ৫৮ জায়গায় যাকাত শব্দটি এসেছে। এর মধ্যে ২৬টি আয়াতে ছালাতের সাথে যাকাত শব্দটি এসেছে।

যাকাত ইসলামের তৃতীয় রুকন। যাকাত বিত্তশালীদের ওপর ফরয। কেউ যাকাত অস্বীকার করলে সে কাফের হিসেবে গণ্য হবে। আর পরকালে তার জন্য শাস্তি রয়েছে। ছালাতের পরই যাকাতের অবস্থান। তাই কুরআনুল কারীমে বহু জায়গায় ছালাতের সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ‘তোমরা ছালাত ক্বায়েম করো, যাকাত আদায় করো’ *(আল-বাক্বারা, ২/৮৩)*। যাকাত না দেওয়া কাফেরদের বৈশিষ্ট্য এবং জাহান্নামের শাস্তির অন্যতম কারণ। যাকাত আর্থিক ইবাদত। যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ - الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

‘হে মুমিনগণ! তোমাদের উপার্জিত উত্তম সম্পদ থেকে এবং তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় করো এবং মন্দ বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না। বস্তুত তোমরা তা নিজেরাই গ্রহণ করো না, যদি না তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে নিয়ে নাও। আর জেনে রেখো, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। শয়তান তোমাদের গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতা-বেহায়াপনার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, মহাজ্ঞানী’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৭-২৬৮)*।

যাকাত আদায়ের উপকারিতা:

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে নিজেকে ও মালকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾

‘তাদের সম্পদ থেকে ছাদাক্বা গ্রহণ করুন, যাতে তা দিয়ে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন’ *(আত-তাওবা, ৯/১০৩)*। যাকাত আদায় করলে পরকালে কোনো ভয় ও চিন্তা থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾

‘যারা নিজেদের সম্পদ রাতে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোনো ভয় থাকবে, তারা দুঃখিতও হবে না’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৭৪)*।

যাকাত আদায় করলে পরকালে তার বিনিময় পাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ﴾

‘বলো, আমার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক্ব প্রশস্ত করেন, আর যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দিবেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিক্বদাতা’ *(সাবা, ৩৪/৩৯)*।

যাকাত কেউ দিবে আর কেউ নিবে এটা আল্লাহর বিধান:

আল্লাহ ধনী ও গরীব উভয় শ্রেণির মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ফলে একে অপরের সহযোগিতা নিতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ﴾

‘আমরা তাদের (মানুষের) মাঝে পার্থিব জীবনের উপকরণ বণ্টন করে দিয়েছি এবং মর্যাদায় কতককে কতকের ওপর সমুন্নত করেছি, যাতে তারা একে অন্যের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। তারা যা সঞ্চয় করে, তোমার রবের অনুগ্রহ তা থেকে উত্তম’ *(আয-যুখরুফ, ৪৩/৩২)*। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুআয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা করে পাঠালেন এবং বললেন,

إِنَّكَ سَتَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

‘(হে মুআয!) তুমি আহলে কিতাবের এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। কাজেই তুমি প্রথমে তাদের এই ঘোষণা করতে আহ্বান করবে, ‘আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য বা মা‘বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল! যদি তারা তোমার এই কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর দিবা-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। তারা যদি তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের বলবে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে। অতঃপর তাদের দরিদ্রদের ফেরত দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয়, তবে সাবধান! (যাকাত আদায়ের সময়) তুমি বেছে বেছে তাদের উত্তম মাল নেবে না। বেঁচে থাকবে মাযলূম বা অত্যাচারিতদের বদদু‘আ হতে। কেননা মাযলূমের বদদু‘আ এবং আল্লাহর মধ্যে কোনো আড়াল বা বাধা থাকে না’।[১] অর্থাৎ তুমি তাদের থেকে শুধু ভালো মাল বেছে নিয়ে যুলম করবে না। কারণ মাযলূমের দু‘আ গৃহীত হয়।

যাকাত আদায় করার শর্তাবলি:

(ক) মুসলিম হওয়া, (খ) স্বাধীন হওয়া, (গ) নিছাবের মালিক হওয়া; মাল স্থিতিশীল থাকা এবং (ঘ) এক বছর পূর্ণ হওয়া।

যে সকল মালের যাকাত দেওয়া ফরয, তা ৫ প্রকার: (১) গৃহপালিত পশু, (২) স্বর্ণ ও রৌপ্যে অথবা এর সমপরিমাণ টাকা থাকলে, (৩) ব্যবসায়িক মালে, (৪) শস্য ও ফলে এবং (৫) খনিজ ও মাটির ভেতরে লুক্কায়িত সম্পদে।

স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ টাকার নিছাব: স্বর্ণের বর্তমান হিসাব ৮৫ গ্রাম, এক ভরি সমান ১১.৬৬ গ্রাম, সে হিসেবে ৭.২৯ ভরি বা ৭ ভরি ৫ আনা ৫ রতি স্বর্ণ। রৌপ্যের নিসাব ৫৯৫ গ্রাম, তথা ৫১.০২ ভরি রৌপ্য হয়। অথবা এর সমমূল্যের টাকা থাকলে, শতকরা ২.৫০ টাকা যাকাত দিতে হবে। ব্যবসায়িক মালের নিছাব- স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিছাবের ন্যায়।

শস্য ও ফলের নিছাব: শস্য ৭৫০ কেজি বা ১৮ মন ৩০ কেজি হলে যাকাত দিতে হবে।[২] যেসব ফল-ফসল পরিমাপযোগ্য, গুদামজাত করা যায় এবং বর্তমান ও পরবর্তী সময়ে উপকৃত হওয়া যায়, এমন সকল উৎপাদিত পণ্যে যাকাত দিতে হবে। যেমন- গম, যব, খেজুর, কিশমিশ, ধান, সরিষা, ভুট্টা ইত্যাদি।[৩] তবে শাকসবজি বা কাঁচামালের যেমন- মরিচ, আলু, টমেটো ইত্যাদিতে যাকাত দিতে হবে না।[৪] তবে কাঁচামালের ব্যবসা করলে বছরান্তে টাকা হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

শস্যক্ষেত্রের যাকাত বা ওশর: মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوْشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

‘আর তিনি সৃষ্টি করেছেন লতা (যা মাচা বা অন্য কিছুকে জড়িয়ে বাড়ে) ও গুল্মবিশিষ্ট (যা স্বীয় কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে) উদ্যানরাজি, খেজুরগাছ ও বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, একই ধরনের ও আলাদা ধরনের যায়তুন ও ডালিম। যখন ফল ধরে, তখন ফল খাও। আর ফসল আহরণ করার দিন এর হক্ব আদায় করো। অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না’ *(আল-আনআম, ৬/১৪১)*। অর্থাৎ ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি হক্ব আরোপ করা হয়েছে আর তা হচ্ছে- আসমানের পানি দ্বারা ফসল উৎপন্ন হলে ১০ ভাগের ১ ভাগ প্রদান করতে হবে। আর সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন হলে ২০ ভাগের ১ ভাগ প্রদান করতে হবে।[৫] আর ফল নামানোর সময় গরীব-মিসকীন উপস্থিত হলে, তাদের কিছু প্রদান করতে হবে। এই হলো ফলের হক্ব। খাজনার জমিতেও উৎপাদিত ফসলের যাকাত বা ওশর দিতে হবে। উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘খাজনা হলো জমির ওপর আর ওশর হলো ফসলের ওপর’।[৬] আর যে হাদীছে এসেছে, ‘মুসলিমদের ওপর একইসাথে খাজনা ও ওশর একত্রিত হয় না’— ইমাম বায়হাক্বী তা বাতিল হাদীছ বলেছেন।[৭]

গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত ৩টি:

(১) নিছাব পরিমাণ হওয়া। আর তা হলো- ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা নিম্নে ৪০টি হলে, গরু-মহিষ ৩০টি এবং উট ৫টি হলে। (২) পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা। (৩) পশু হতে হবে বিচরণশীল অর্থাৎ যে পশু বছরের অধিকাংশ সময় নিজেই বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। আর বছরের অধিকাংশ সময় মালিক নিজে খাদ্য সংগ্রহ করে খাওয়ালে সে পশুর ওপর যাকাত ফরয নয়।[৮]

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬।
২. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৮৪।
৩. মাজমূ‘ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত বিন বায (রহিমাহুল্লাহ), ১৪/৬৮।
৪. ছহীহ জামিউছ ছগীর, হা/৫৪১১।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৮৩।
৬. মা‘রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হা/৮২৪৮।
৭. ইমাম বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, হা/৭৪৯৯।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৫৪।

যাকাতের মাল ব্যয়ের খাতসমূহ:

কুরআন মাজীদে যাকাত ও ছাদাক্বার মাল ব্যয়ের ৮টি খাতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

‘ছাদাক্বা হলো ফকীর, মিসকীন, তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী, যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী’ *(আত-তাওবা, ৯/৬০)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ﴾ ‘ধনীদের সম্পদে রয়েছে যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার’ *(আয-যারিয়াত, ৫১/১৯)*।

যাকাত আদায় না করার ভয়াবহতা:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ﴾

‘যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে আর আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করে তা দিয়ে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। আর তাদের বলা হবে, এটা হলো সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। কাজেই যা জমা করেছিলে, তার স্বাদ গ্রহণ করো’ *(আত-তাওবা, ৯/৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘কোনো ধনী ব্যক্তি তার মালের হক্ব (তথা যাকাত) আদায় না করলে ক্বিয়ামতের দিন স্বর্ণ ও রৌপ্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তার ললাটে, তার পার্শ্বদেশে সেঁক দেওয়া হবে। এমন শাস্তি অব্যাহত থাকবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করার দিন পর্যন্ত। যে দিন হবে তোমাদের গণনা অনুসারে ৫০ হাজার বছরের সমান। এরপর সে নিজের গন্তব্যস্থান চাক্ষুষ দেখবে, হয়তো জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আর যে মেষপালের মালিক তার যাকাত দেয় না, ক্বিয়ামাতের দিন সেগুলো পূর্বের চেয়ে অধিক সংখ্যক ও মোটা-তাজা অবস্থায় উপস্থিত হবে এবং তাকে শিং দিয়ে গুঁতা মারবে ও খুর দিয়ে দলিত করবে। ওসবের কোনোটিই বাঁকা শিংবিশিষ্ট বা শিংবিহীন হবে না। যখন সর্বশেষ জন্তু তাকে দলিত করে চলে যাবে, তখন প্রথমটিকে আবার তার কাছে আনা হবে। এরূপ চলতে থাকবে বান্দাদের মধ্যে মীমাংসা করার দিন পর্যন্ত। যে দিনটি হবে তোমাদের হিসাব মতে ৫০ হাজার বছরের সমান। এরপর সে তার গন্তব্যস্থান প্রত্যক্ষ করবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আর যে উটের মালিক তার উটের যাকাত দেয় না, ক্বিয়ামাতের দিন ঐ উট পূর্বের চেয়েও সংখ্যায় অধিক ও মোটা-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। তাকে এর বিশাল সমভূমিতে উপুড় করে শোয়ানো হবে এবং উটগুলো তাকে খুর দিয়ে দলিত করতে থাকবে। সর্বশেষ উটটি তাকে অতিক্রম করার পর প্রথমটিকে আবার তার কাছে আনা হবে। এরূপ চলতে থাকবে বান্দাদের মধ্যে মীমাংসা করার দিন পর্যন্ত। যে দিনটি হবে তোমাদের হিসাব মতে ৫০ হাজার বছরের সমান। অতঃপর সে তার গন্তব্যস্থল প্রত্যক্ষ করবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম’।[৯] যাকাত সঠিকভাবে আদায় হলে সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সকল অপরাধ উঠে যাবে।

যারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে না এবং যাকাত আদায় করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রাসূল ﷺ-কে দেওয়া হয়েছে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

‘আমি লোকদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব মা‘বূদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত প্রদান করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করল। তবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোনো কারণ থাকে, তাহলে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর থাকবে’।[১০]

পরিশেষে, প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, যথাযথভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৯. আবূ দাঊদ, হা/১৬৫৮।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/২৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২২।

ছাদাক্বাতুল ফিতরের আদ্যোপান্ত

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

ইসলাম আমাদের সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা শিক্ষা দেয়। রামাযানের এক মাস ছিয়াম সাধনার পর আসে পবিত্র ঈদুল ফিতর। ধনী-গরীব সকলে মিলে যেন সমানভাবে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে, সেজন্য ইসলাম ব্যবস্থা করেছে ছাদাক্বাতুল ফিতর নামে একটি দানের খাত। এই দানকে যাকাতুল ফিতরও বলা হয়। আজ আমরা ফিতরা নামে যে দানের পদ্ধতি ইসলামে চালু রয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ।

ছাদাক্বাতুল ফিতর কী?

ফিতরা আরবী শব্দ, যা ইসলামে যাকাতুল ফিতর বা ছাদাক্বাতুল ফিতর ইত্যাদি নামে পরিচিত। ছাদাক্বা অর্থ হলো দান, আর ফিতর অর্থ ছিয়ামের সমাপন বা শেষ। ফাতূর বলতে সকালের খাদ্যদ্রব্যকে বোঝানো হয়। আবার ফাতূর, ফিতর ও ইফতার—এই শব্দগুলো সে খাবার অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে যা দ্বারা সূর্যাস্তের পর ছিয়াম পালনকারীরা তাদের ছিয়াম ভঙ্গ করেন।[১] সুতরাং ছাদাক্বাতুল ফিতর বা যাকাতুল ফিতর হলো আবশ্যিক দান, যা প্রত্যেক মুসলিম রামাযান মাস শেষে ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে গরীব ও দুঃখীদের প্রদান করে থাকেন।[২]

ছাদাক্বাতুল ফিতর কেন দিতে হয়?

ইসলামে সম্পদের পবিত্রতার জন্য যেমন যাকাত দিতে হয়, ঠিক তেমনি রামাযানের ছিয়ামের পবিত্রতার জন্যও ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। আরও সহজ করে বললে বলতে হয়, রামাযানে ছিয়াম পালন করতে গিয়ে প্রতিটি মানুষেরই অবচেতন মনে কোনো না কোনোভাবে ছিয়ামের অনেক সাধারণ ভুলত্রুটি (যেমন: ছিয়ামরত অবস্থায় অবাঞ্ছনীয় ও অসার কথা বলা, গীবত করা, অশ্লীল কথাবার্তা, গালিগালাজ করাসহ নানান ছোটখাটো গুনাহ) হয়ে থাকে। সেই ত্রুটিবিচ্যুতিরই ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনী হচ্ছে ছাদাক্বাতুল ফিতর, যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের উপর ফযর করেছেন। যাকাত যেমন অর্থ-সম্পদকে পবিত্র করে, ঠিক তেমনি ফিতরাও ছিয়ামকে পরিশুদ্ধ করে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন ছিয়াম পালনকারীকে অনর্থক ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে পবিত্র করতে ও গরীবের আহারের ব্যবস্থা করতে...’।[৩]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ছাদাক্বাতুল ফিতরের উদ্দেশ্য গরীবদের ঈদের খুশিতে শরীক করার পাশাপাশি এই দানের ফলে আমাদের ছিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতিও দূরীভুত হয়।

কাদের উপর ফিতরা ওয়াজিব?

ফিতরা সেই মুসলিমের উপর ফরয, যে ব্যক্তির নিকট ঈদের রাত ও দিনে নিজের এবং পরিবারের আহারের প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত খাদ্য মজুদ থাকে। আর এই ছাদাক্বার হিসাবের মধ্যে প্রতিটি মুসলিম অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে পরিবারে স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট, বড়, বাচ্চা, ধনী ও গরীব, শহরবাসী ও মরুবাসী ছিয়াম পালনকারী, ভঙ্গকারী ইত্যাদির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।[৪] এক কথায় এ দান পরিবারের সকল সদস্যকে হিসাবে রেখে পরিবারে যতজন সদস্য আছে, ততজনের ফিতরা আদায় করতে হবে। ছাদাক্বাতুল ফিতর ফরয হওয়ার জন্য যাকাতের সমপরিমাণ নিসাব হওয়া শর্ত নয়। যেহেতু তা ব্যক্তির উপর ফরয, সম্পদের উপর নয়।

ফিতরা ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য:

ফিতরাকে যাকাত সম্বোধন করলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন: ফিতরা এমন ব্যক্তির উপরও ওয়াজিব, যার বাড়িতে সামান্য কিছু খাবার আছে। কিন্তু যাকাত কেবল তার উপর ফরয, যার নিসাব পরিমাণ অর্থসম্পদ রয়েছে। যাকাত বাৎসরিক জমাকৃত ধনসম্পদের কারণে দিতে হয়। আর ফিতরা ছিয়ামের ত্রুটিবিচ্যুতির কারণে দিতে হয়।

ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায়ের সময়:

ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায়ের ফযীলতপূর্ণ সময় হলো রামাযানের শেষ ছিয়ামের সূর্যাস্তের পর থেকে ঈদের ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, ‘নবী ﷺ লোকদের ঈদের ছালাতের জন্য বের হওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন’।[৫] সুতরাং ঈদের দিন ফিতরা আদায় করা সর্বোত্তম। তবে ঈদের এক-দুই দিন পূর্বেও আদায় করা যায়। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম এরূপ করেছেন।[৬]

---

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

১. মু‘জামুল লুগাহ আল-আরাবিয়া আল-মুআছারা, আল-মুহীত্ব।

২. প্রাগুক্ত।

৩. আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৯।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৫১১।

ঈদের ছালাতের পর ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় করা শুদ্ধ নয়। করলে তা ছাদাক্বাতুল ফিতর হবে না; বরং সাধারণ ছাদাক্বা বলে গণ্য হবে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, '...যে ব্যক্তি ছালাতের আগে তা আদায় করবে, তবে তার ছাদাক্বা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাতের পর আদায় করবে, তার ছাদাক্বা সাধারণ দান বলে গণ্য হবে'।[৭] অর্থাৎ কেউ ঈদের জামাআতের পর ফিতরা আদায় করলে তা সাধারণ দানে পরিণত হবে। ছাদাক্বাতুল ফিতরের যে নেকী, তা পাওয়া যাবে না। তাই ফিতরার খাদ্য ঈদের ছালাতের আগেই বণ্টন করা ওয়াজিব। ঈদের ছালাত পর্যন্ত দেরি করা উত্তম নয়। বরং ঈদের এক বা দুই দিন আগে আদায় করলেও অসুবিধা নেই। যাতে গরীব-দুঃখীরা আগে থেকেই ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে। এছাড়া ফিতরা আদায়ের সময় যাতে সংকীর্ণ না হয়, সেইজন্য ঈদুল ফিতরের ছালাত সামান্য দেরিতে পড়া উত্তম। এতে করে ফিতরা আদায়ের যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

কে ফিতরা পাবে?

কারা ফিতরা পাওয়ার যোগ্য বা কোন কোন প্রকারের লোক ফিতরা নিতে পারবে? এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। একদল আলেম মনে করেন, যারা সাধারণ সম্পদের যাকাতের হক্বদার, তারাই ছাদাক্বাতুল ফিতরের হক্বদার। তাদের দলীল হলো, ফিতরাকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাকাত ও ছাদাক্বা বলেছেন। তাই যেটা সম্পদের যাকাতের খাত হবে, সেটা ফিতরারও খাত হবে। ছাদাক্বার যেই খাত আল্লাহ সূরা তওবায় উল্লেখ করেছেন সেই খাতগুলো ছাদাক্বাতুল ফিতরের জন্যও হবে। সুতরাং সেই হিসাবে আট প্রকার লোক ছাদাক্বাতুল ফিতরের হক্বদার। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

'যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক্ব এবং তা দাস-মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(আত-তওবা, ৯/৬০)*।

আরেক দল আলেম মনে করেন, ছাদাক্বাতুল ফিতর বা ফিতরা কেবল ফকীর-মিসকীনদের হক্ব; অন্যদের নয়। তাদের দলীল হলো, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর হাদীছ, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন ছিয়াম পালনকারীর অশ্লীলতা ও অনর্থক ক্রিয়াকলাপ হতে পবিত্রতা এবং মিসকীনদের আহারস্বরূপ...'।[৮]

সুতরাং উপর্যুক্ত হাদীছে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে, 'মিসকীনদের আহারস্বরূপ' তথা— গরীব, দুস্থ, অসহায়, অভাবগ্রস্তকেই ফিতরা প্রদান করতে হবে। উক্ত মতকে সমর্থন করেছেন ইবনু তায়মিয়া, ইবনুল ক্বাইয়িম, শাওকানী, আযীমাবাদী, ইবনু উছায়মীনসহ আরও অনেকে।[৯] অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে এই মতটি অধিক ছহীহ। কারণ এই মতের পক্ষে স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান।

উল্লেখ্য, কারো অধীনস্থ চাকরবাকরকে বেতনের পরিবর্তে ফিতরা দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে বেতনসহ ফিতরা দেওয়া যেতে পারে। ফিতরার খাদ্যসমূহের মধ্যে মসজিদ, মাদরাসা অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক এবং মসজিদের ইমাম যদি ফকীর-মিসকীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তারা ফিতরার হক্বদার হবেন। বরং তারা অন্যান্য ফকীর-মিসকীনদের থেকেও বেশি হক্বদার হবেন। কেননা এরা দ্বীনের শিক্ষা অর্জনে ও অন্যকে শিক্ষা দানে নিয়োজিত, যে গুণটি অন্যান্য ফকীর-মিসকীনের নেই।

কী দিয়ে ফিতরা দিতে হয়?

আমাদের উপমহাদেশে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা হলেও হাদীছে খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায়ের কথা এসেছে। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে বর্তমান থাকা অবস্থায় আমরা ছাদাক্বাতুল ফিতর বাবদ এক ছা' খাদ্য (গম) বা এক ছা' খেজুর বা এক ছা' যব বা এক ছা' পনির অথবা এক ছা' কিশমিশ দান করতাম। আমরা অব্যাহতভাবে এ নিয়মই পালন করে আসছিলাম। অবশেষে মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) মদীনায় আমাদের নিকট আসেন এবং লোকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আমি শাম দেশের উত্তম গমের দুই মুদ পরিমাণকে এখানকার এক ছা'র সমান মনে করি। তখন থেকে লোকেরা এ কথাটিকেই গ্রহণ করে নিল। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি কিন্তু সারা জীবন ঐ হিসাবেই ছাদাক্বাতুল ফিতর পরিশোধ করে যাব, যে হিসাবে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে তা পরিশোধ করতাম।[১০]

---

৭. আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯।

৮. আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯; ইরওয়াউল গালীল, হা/৮৪৩।

৯. মাজমূউ ফাতাওয়া, ২৫/৭৩; যাদুল মাআদ, ২/২২; নায়লুল আওতার, ৩-৪/৬৫৭; আওনুল মা'বূদ, ৫-৬/৩; শারহুল মুমতি, ৬/১৮৪।

১০. ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৫, ১৫০৬, ১৫০৮, ১৫১০; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৫।

উপরিউক্ত হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ফিতরা আদায়ের নির্দেশ হচ্ছে, খাদ্যদ্রব্য। যেমন: গম, খেজুর, যব, পনির, কিশমিশ। এই পাঁচটি নিয়মিত খাদ্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ফিতরা আদায় করা হতো। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায় করা সুন্নাহ।

ফিতরার পরিমাণ:

উল্লিখিত হাদীছেও এসেছে কী পরিমাণ খাদ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতরা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য মাথাপিছু এক ছা‘ খাদ্যশস্য ছাদাক্বাতুল ফিতর হিসাবে দিতে হবে। ছা‘ হচ্ছে তৎকালীন সময়ের এক ধরনের পরিমাপক পাত্র, যাতে মধ্যম আকৃতির চার অঞ্জলি খাবার ধরত। এজন্য বিভিন্ন শস্যের ওযন থেকে কমবেশি হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ হচ্ছে তৎকালীন প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের এক ছা‘ দ্বারা একজনের ফিতরা আদায় করা। সেই হিসাবে আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত খাদ্যদ্রব্য হচ্ছে চাউল এবং আটা। সুতরাং সুন্নাহ হলো চাউল বা আটা দ্বারা এক ছা‘ করে একজনের ফিতরা আদায় করা। বর্তমানে আমাদের দেশে এক ছা‘-তে প্রায় আড়াই কেজি চাউল হয়।

ছা‘ নিয়ে মতভেদ:

আমাদের উপমহাদেশে অর্ধ ছা‘ গম বা আটার পরিমাপের অর্থ দ্বারা ফিতরা নির্ধারণ করা হয়। যদিও হাদীছে পাঁচটি খাদ্যদ্রব্যের এক ছা‘ দেওয়ার কথা এসেছে। অর্ধ ছা‘ ফিতরা দেওয়ার ফতওয়াটি মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর। যা উল্লিখিত হাদীছ থেকে বুঝা যায়।

একই সাথে হাদীছে এসেছে এক ছা‘ দেওয়ার কথা। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং ইসলামের চার খলীফা পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরে মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা নির্বাচিত হন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা থেকে দামেস্কে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর দামেস্ক থেকে মদীনায় গম আমদানি হতে থাকে। সে সময় সিরিয়ার গমের মূল্য খেজুরের দ্বিগুণ ছিল। তাই খলীফা মুআবিয়া কোনো এক হজ্জ বা উমরা করার সময় মদীনায় আসলে মিম্বারে বলেন, আমি অর্ধ ছা‘ গমকে এক ছা‘ খেজুরের সমতুল্য মনে করি। লোকেরা তার এই কথা মেনে নেয়। এর পর থেকে মুসলিম জনগণের মধ্যে অর্ধ ছা‘ ফিতরার প্রচলন শুরু হয়।

উপর্যুক্ত কারণগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, এক ছা‘ মদীনার পরিমাপেই একটি ফিতরা আদায় করতে হবে। কেউ যদি মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর ফতওয়া অনুযায়ী অর্ধ ছা‘ দিয়ে ফিতরা দেয়, তাহলে তা সুন্নাহসম্মত হবে না। কেননা উপরের উল্লিখিত হাদীছে ছাহাবী আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-সহ তৎকালীন অনেকে মুআবিয়ার ফতওয়াকে মেনে নেননি।

ছাদাক্বাতুল ফিতরের উপকারিতা:

(১) এ দান ছিয়াম পালনকালীন সময়ে অনর্থক কথা ও অশ্লীল কথা বলার কারণে ছিয়ামের মধ্যে যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছিল তা পুষিয়ে দেয়।

(২) রাসূলুল্লাহ ﷺ হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তিনি সমাজে সমাজব্যবস্থা তৈরি করার জন্য এই ছাদাক্বার প্রচলন করেছেন। যাতে ধনী, গরীব, দুঃস্থ, অসহায় সকলে মিলে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

(৩) এছাড়াও আল্লাহ আমাদের শারীরিক সুস্থতা দান করেছেন। যার কারণে আমরা বেঁচে থেকে সুস্থ শরীরে এক মাস ছিয়াম পালন করতে পারছি। সুস্থতা এবং আমল করতে পারার কারণে আল্লাহর নিকট শুকরিয়াস্বরূপ এই ফিতরা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, এমন প্রত্যেক মুসলিমকে তার ও তার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে, যার ঘরে দুই তিন বেলার পর্যাপ্ত খাবার রয়েছে। একইসাথে খাদ্যদ্রব্য দ্বারাই ফিতরা আদায় করতে হবে। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্নাহ পদ্ধতিতে ফিতরা আদায় করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন।

ইবাদত হোক আল্লাহর জন্য নিবেদিত

-মাহমুদ হাসান ফাহিম*

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। আর আল্লাহ তাআলা কেবল ইবাদতের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾ ‘আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমারই ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছি’ *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*।

আয়াতের বাচনভঙ্গি থেকে বুঝা যায়, মানুষ সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার হুকুম পালন করবে।

পূর্বের আলোচনা থেকে জেনেছি, আল্লাহর ইবাদতের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ আল্লাহর গোলামি করবে, তার দাসত্ব করবে, তিনি এমনটিই চান। আর এর মাধ্যমেই যেহেতু কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা নিবেদন পুরোপুরি প্রকাশ পায়। তাই পবিত্র কুরআনে বারবার এ কথাই বলা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আমরা আল্লাহর ইবাদত করি। আমাদের সেই ইবাদত একনিষ্ঠভাবে তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হতে হবে। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তা যেন নিষ্প্রাণ হয়ে না যায়। অবশ্যই এ বিষয়ে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, অন্যথা নিষ্প্রাণ ইবাদত কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। যেমন আমরা ছালাত পড়ি, কুরআনে বলা আছে ‘ছালাত গুনাহ থেকে ফেরায়’ বাস্তবে দেখা যায়, আমরা ছালাতও পড়ি, আবার গুনাহও করি। যে ছালাত আমাকে গুনাহ থেকে ফেরাতে পারে না, কোন অর্থে তাকে ছালাত বলতে পারি?

লোক দেখানো ছালাত বা অন্য কোনো ইবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হয় না। মূলত লোক দেখানো ইবাদত মুনাফেক্বদের অভ্যাস। জনসম্মুখে খুব ভালোভাবে ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা পালন করলেও বস্তুত তাতে প্রাণ বলতে কিছু নেই। এমন ইবাদতকারীর বিরুদ্ধে কুরআনে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,- ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ﴾ ‘দুর্ভোগ ওই ছালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের ছালাতে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা আদায় করে’ *(আল-মাঊন, ১০৭/৪-৬)*। তাই ইবাদতের ক্ষেত্রে আন্তরিক হওয়া কাম্য। কেননা তা একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদন করা হচ্ছে।

দ্বীনের শাখাগত আমলগুলোর মধ্যে ছালাতের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এটি যাবতীয় সৎকর্মের প্রাণ ও দ্বীনের স্তম্ভ। অন্যসব ইবাদত তথা সমগ্র জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপও একনিষ্ঠভাবে বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহর জন্য নিবেদিত হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ ‘বলুন! আমার ছালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ, সবই বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহর জন্য নিবেদিত’ *(আল-আনআম, ৬/১৬২)*।

এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল। জীবনের প্রতিটি কাজ ও অবস্থায় এ কথা মনে রাখা যে, সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর গোলাম। তিনি দেখছেন, সর্বদা তাঁর দৃষ্টির সামনে আমি ও আমরা। আমার অন্তর, মস্তিষ্ক, চোখ, কান, হাত, পা ও প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। মানুষ যদি অন্তর ও মস্তিষ্কে এ মুরাকাবা ও ধ্যানকে সদা সর্বদা উপস্থিত রাখে, তবে সে বিশুদ্ধ অর্থে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারবে। যাবতীয় পাপ ও অপরাধ থেকে পুত-পবিত্র জীবনযাপন করতে পারবে।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ

১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু
- সরিষা ফুলের মধু
- লিচু ফুলের মধু
- বরই ফুলের মধু
- কালোজিরা ফুলের মধু
- মিক্স ফুলের মধু
- পাহাড়ী ফুলের মধু
- সুন্দরবন বিখ্যাত খলিশা ফুল
- চাকের মধু

অন্যান্য জিনিস
- আখের গুড়
- মৌসুমের খেজুরের গুড়
- মধুময় বাদাম
- উন্নত মানের খেজুর
- সরিষার তেল
- কালোজিরা তেল
- জয়তুন তেল
- যবের ছাতু
- দানাদার ঘি
- বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়

যোগাযোগ করুন!

০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন

ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

* শিক্ষক, বায়তুল আকরাম মসজিদ ও মাদরাসা কমপ্লেক্স, সুরতরঙ্গ রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

কীভাবে ইসলাম প্রকৌশল বিদ্যা শিখতে এবং প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে

*-নাফিউল হাসান**

ভূমিকা: ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যা শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। কুরআন ও হাদীছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি গভীর আগ্রহ ও প্রেরণা পাওয়া যায়। ইসলামী দর্শন অনুসারে, প্রকৃতির সবকিছু আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের উচিত সেই সৃষ্টির গভীরতা অন্বেষণ করা। এভাবে ইসলাম প্রকৌশল বিদ্যা শিখতে এবং প্রয়োগ করতে অনেক অনুপ্রেরণা দেয়।

(১) কুরআন প্রাকৃতিক ঘটনা অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করে: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ 'মহাবিশ্বে ও তাদের নিজেদের মধ্যে অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য' *(ফুছছিলাত, ৪১/৫৩)*। এই আয়াতটি আমাদেরকে প্রকৃতির নিদর্শনগুলো খুঁজে বের করার জন্য উৎসাহিত করে। যেমন- বিদ্যুৎ, আলো ও চুম্বকত্ব এবং এসবের মাধ্যমে এমন প্রযুক্তি তৈরি করতে, যা মানবতার উপকারে আসে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾ 'আর তিনি তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদকে এবং তারকাসমূহও তাঁর নির্দেশের নিয়ন্ত্রণাধীন...' *(আন-নাহল, ১৬/১২)*। এই আয়াত আমাদের সৌরশক্তি অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করে, আর নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

(২) মুসলিম বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের উত্তরাধিকার: 'রোবোটিক্সের জনক' হিসেবে পরিচিত আল-জাযারীর জলঘড়ি এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলো আধুনিক অটোমেশন এবং রোবোটিক্সের পূর্বসূরি ছিল। তার কাজ আমাদের মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের একত্রিতকরণ নিয়ে গবেষণার অনুপ্রেরণা দেয়, যা কন্ট্রোল সিস্টেম এবং IoT (ইন্টারনেট অব থিংস)-এ গবেষণার পথ খুলে দেয়।[১]

'অপটিক্স ও দৃষ্টিবিজ্ঞানে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী আল-হাজেন আধুনিক ফাইবার অপটিক্স এবং ইমেজিং প্রযুক্তিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছেন। তার পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ও আলো অধ্যয়ন ফোটোনিক্স এবং ইলেকট্রনিক্স সেন্সরগুলোর উন্নয়নকে গাইড করেছে।[২]

তার বই 'দ্য বুক অব ইনজেনিয়াস ডিভাইসেস'-এ প্রাথমিক প্রোগ্রামেবল মেশিনের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা ডিজিটাল সিস্টেমের উদ্ভাবনের জন্য উৎসাহ দেয়। যেমন- সার্কিট ডিজাইন এবং এম্বেডেড সিস্টেম।[৩]

(৩) নৈতিক ও টেকসই প্রকৌশল বিদ্যা: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ 'হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ছালাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ করো আর খাও এবং পান করো; কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না' *(আল-আ'রাফ, ৭/৩১)*। এই আয়াত প্রকৌশলীদের উদ্দীপনা দেয় শক্তি, দক্ষতা, পরিবেশবান্ধব সিস্টেম তৈরি করতে। যেমন- নবায়নযোগ্য শক্তি সমাধান এবং টেকসই ইলেকট্রনিক্স।

ইসলামী নীতি খিলাফাহ (অধিকার): প্রকৌশলীরা পৃথিবীর সম্পদের রক্ষক এবং তাদের উচিত প্রযুক্তির টেকসই ও নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, টেকসই শক্তি সিস্টেম ডিজাইন, বৈদ্যুতিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার এবং দক্ষ ডিভাইস তৈরি করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ 'আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করব। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা তাতে ফ্যাসাদ করবে এবং রক্তপাত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসার সহিত তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না' *(আল-বাক্বারা, ২/৩০)*।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৫ নং পৃষ্ঠায়)

* প্রভাষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ।

১. Al-Jazari, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices, 1206.

২. Ibn al-Haytham, Book of Optics, 1021.

৩. Banu Musa, The Book of Ingenious Devices, 850.

শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল: জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে উপলব্ধি ও শিক্ষা

*[মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. আব্দুল বারী ইবনু আওয়ায আছ-ছুবাইতী** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।** খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এমন প্রশংসা যার ব্যাপ্তি অপরিসীম। যার পুরস্কার কখনো বন্ধ হয় না এবং যার গুণকীর্তন করে শেষ করা যায় না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। যিনি দৃশ্যমান কোনো খুঁটি ছাড়াই আসমানসমূহকে সুউচ্চে স্থাপন করেছেন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। যাকে মহান আল্লাহ হেদায়াত ও রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন আর তিনি এমন এক আলোকবর্তিকা ছিলেন, যার দেখানো পথই অনুসরণীয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর, তাঁর বংশধরদের উপর, সমস্ত ছাহাবী ও তাঁর অনুসরণকারীদের উপর দরূদ অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, আমি নিজেকে ও আপনাদেরকে আল্লাহভীতি অবলম্বনের অছিয়ত করছি, যাকে আল্লাহ তাআলা নাজাতের পথ ও মুমিনদের পাথেয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে আনুগত্যশীলদেরকে মুত্তাক্বীদের স্তরে উন্নীত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন দুর্বল বস্তু থেকে এবং দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন। আর শক্তির পর তিনি আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান' *(আর-রূম, ৩০/৫৪)*। এই আয়াতটি জীবনের গতিপথকে প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় ও গভীর তাৎপর্যের সাথে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছে। এতে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ চিত্রিত হয়েছে। যার শুরু হয় দুর্বল শৈশব থেকে এবং শেষ হয় শক্তিধর হওয়ার মধ্য দিয়ে। এরপর আবার মানুষ ধীরে ধীরে বার্ধক্যের মোড়কে দুর্বলতায় ফিরে আসে। এই আয়াতটি মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে; যাতে সে মানবীয় দুর্বলতা বুঝতে পারে এবং অন্তরকে যেন সকল প্রয়োজনে সর্বদা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে পারে।

আয়াতটি আমাদের সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ, শক্তি ও দুর্বল অবস্থার পরিবর্তন এবং মহান আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করতে আহ্বান করে; যেই ক্ষমতা এই গতিপথকে প্রজ্ঞা ও নিপুণতার সাথে পরিচালনা করছে। সকল কিছুর ক্ষমতা তাঁর হাতেই। তাঁর থেকেই সবকিছুর শুরু হয় এবং তাঁর নিকটে গিয়েই আবার শেষ হয়।

শৈশবকাল জীবন ডায়েরির প্রথম পাতা। এ জীবন নিষ্পাপ ও দুর্বলতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়, যাকে আল্লাহর দয়া ও রহমত আবৃত করে রাখে। এমন ছোট্ট শিশু অবস্থায় তার জীবনের সূচনা হয়, যার নিজের কোনো কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু মহান আল্লাহ তার চারপাশের মানুষের হৃদয়ে তার জন্য মমতা ও ভালোবাসা সঞ্চার করেন এবং তাকে এমন কিছু হাত দ্বারা বেষ্টন করে রাখেন, যে হাতগুলো তাকে লালনপালন করে এবং তার দুর্বলতাকে লাঘব করে। এটি এমন এক বিস্ময়কর চিত্র, যা আল্লাহর মহাব্যবস্থাপনার দিকটি প্রমাণ করে। মহান আল্লাহ এই দুর্বল শিশুকে এমনভাবে রক্ষা ও সাহায্য করেন, যা তার কল্পনাতেও ছিল না। মানব সন্তান মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে এমন অবস্থায় বের হয়ে আসে, যখন তার কোনো জ্ঞান বা ক্ষমতা থাকে না, সম্পূর্ণ অপারগ ও এক চরম অজ্ঞতার মধ্যে তার জন্ম হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা তার জন্য জ্ঞানের দরজা খুলে দেন এবং তাকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও আকল দান করেন, যার মাধ্যমে সে শিক্ষা ও জ্ঞানের উৎসের সন্ধান লাভ করে। মানুষ যে জ্ঞান বা শক্তি অর্জন করে, তা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, চক্ষু ও অন্তর। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর' *(আন-নাহল, ১৬/৭৮)*।

এই বাস্তবতা মানুষের অন্তরে দাসত্বের শিষ্টাচার এবং হৃদয়ে আনুগত্যশীলদের বিনয়-নম্রতার বীজ বপন করে। তাই কখনোই মানুষের জন্য স্বীয় জ্ঞানের কারণে অহংকার করা বা স্বীয় শক্তির কারণে ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়।

মানুষের উপলব্ধি করা উচিত যে, তার শক্তির প্রতিটি বিন্দু ও দেহের নড়াচড়া করার ক্ষমতা আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ, যা তাঁর জন্য স্থায়ী কৃতজ্ঞতা ও পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রকাশকে আবশ্যক করে। কাজেই বান্দা যত উঁচু মর্যাদার অধিকারীই হোক না কেন, সে সর্বদা স্বীয় রবের প্রতি মুখাপেক্ষী ও প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর অনুগ্রহের ভিখারী। মূলত, তার পুরো জীবনটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান, যা সার্বক্ষণিক প্রশংসার দাবি রাখে। কাজেই আল্লাহর স্বয়ংসম্পূর্ণতা কতই না মহান আর তাঁর সামনে বান্দার নিঃস্বতা কতই না চরম পর্যায়ের! মহান আল্লাহ বলেন, ‘দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন’ *(আর-রূম, ৩০/৫৪)*।

তাই যৌবনের বিভিন্ন স্তর তার শক্তির উৎস, জীবনের স্পন্দন এবং সফলতার প্রদীপ, যা ভবিষ্যতের পথকে আলোকিত করে। এই বয়সে ব্যক্তির সক্ষমতা বিকশিত হয়, স্বপ্ন উন্মোচিত হয় এবং মর্যাদার নিদর্শন অঙ্কিত হয়। যৌবন এমন এক সম্পদ যার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, এটি ব্যক্তির কর্ম ও তৎপরতার ময়দান। এই স্তরেই সংগ্রামের মহাকাব্য লিখা হয় ও সভ্যতার শক্তিশালী ভিত নির্মিত হয়। যুবকদের সর্বোচ্চ সাহায্য ও উচ্চ সাহসিকতা ব্যতীত কখনোই একটি দেশের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে না এবং জাতি উন্নতিও লাভ করতে পারে না।

নিঃসন্দেহে দ্বীনের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের মধ্য দিয়েই তারুণ্যের শক্তি বিকশিত হয়। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সংস্পর্শেই কেবল তারুণ্য অগ্রগতি লাভ করে এবং দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগের মাধ্যমেই তা মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

বস্তুত যে ব্যক্তি তার যৌবনকে নষ্ট করল, সে তার পুরো জীবনকেই নষ্ট করল। আসলে তা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের একটি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত। যে ব্যক্তি এ সময়কে কল্যাণ ও উপকারের কাজে নিয়োজিত করবে, সে একটি ভালো নিদর্শন রেখে যাবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে পরিপক্ক ফল আহরণ করবে।

আমরা যেন এটা ভুলে না যাই যে, যৌবনের শক্তি কখনও কখনও নেয়ামত থেকে শাস্তিতে রূপান্তরিত হয়, বিনির্মাণের পরিবর্তে ধ্বংসের শক্তিতে পরিবর্তিত হয়; যদি তরুণ সমাজ আল্লাহর পথ বর্জন করে, ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

মহান আল্লাহর বাণী, ‘দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন’ *(আর-রূম, ৩০/৫৪)*। এই শক্তি কেবল দেহের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা শক্তিশালী আত্মা, উন্নত চিন্তা ও কঠোর সংকল্পের সমন্বিত রূপ। এমন অনেক শক্তিশালী দেহ রয়েছে, যা দুর্বল ইচ্ছা ও মন্থর সংকল্প ধারণ করে। ফলে সে কিছুই করে না এবং কোনো ফলাফল লাভেও সক্ষম হয় না। সে তার পুরো যৌবনকে নষ্ট করে ফেলে। কাজেই সে তার আশপাশের লোকদের জন্য বোঝায় পরিণত হয় এবং নিজেকে ও নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে অক্ষম হয়।

প্রকৃত শক্তি ঈমানী সুবাস থেকে নির্গত হয়, আনুগত্যের মাধ্যমে তীক্ষ্ণ হয়, ইস্তিগফারের মাধ্যমে মজবুত হয় এবং সৎ আমলের মাধ্যমে তা ফল প্রদান করে। এটা এমন শক্তি যা তার রবের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। ফলে রবের পথে তার সংকল্প ও অবিচলতা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ হূদ আলাইহিস সালাম-এর ভাষায় বলেন, ‘হে আমার ক্বওম! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, অতঃপর তাঁর কাছে তওবা করো; তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন’ *(হূদ, ১১/৫২)*। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর শক্তির পর তিনি আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য’ *(আর-রূম, ৩০/৫৪)*।

আল্লাহর হিকমতে এভাবেই জীবনের পর্যায় অতিবাহিত হয়, যা দুর্বল শৈশব থেকে শুরু হয়ে যৌবনে শক্তির শীর্ষে উন্নীত হয়, অতঃপর বার্ধক্যে গিয়ে পৌঁছায়; যখন শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, মাথার চুল সাদা হয়ে যায়, হাড়গুলো ধ্বংসের উপক্রম হয় এবং আল্লাহর সাক্ষাৎ নিকটবর্তী হয়ে আসে। যখন চুলে বার্ধক্যের ধূসর চিহ্ন প্রকাশ পায়, তখন চোখের সামনে থেকে দুনিয়ার পর্দা সরে যায় এবং তার ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, জীবনে সময়গুলো যেন চোখের পলকে অতিবাহিত হয়েছে আর জীবন অতিবাহিত হয়েছে একটি অতিক্রান্ত স্বপ্নের ন্যায়; তখন সে মনে মনে বলে, হায়! যদি আমার সম্প্রদায় জানত যে, দুনিয়া হলো একটি অতিক্রমের স্থান এবং এটি কারো জন্য স্থায়ী নয়!

বার্ধক্য হলো এক নীরব বার্তা, যা আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করে। ফলে বার্ধক্য মানব হৃদয়ের প্রধান ব্যস্ততায় রূপ নেয়। তখন তওবা তার কাছে অগ্রাধিকার পায়, আত্মসমালোচনা তার অভ্যাসে পরিণত হয় আর আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়ে ওঠে তার প্রধান উদ্দেশ্য। এটিকে সে জীবনের শেষ সুযোগ মনে করে, যা তাকে অবশিষ্ট সময়কে সুন্দর করা এবং আসমান ও জমিনের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য প্রেরণা জোগায়।

উল্লেখ্য যে, বার্ধক্য মানেই দুর্বলতার কাছে আত্মসমর্পণ বা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নয়; বরং এর মাধ্যমে এমন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়, যেখানে প্রজ্ঞা দীপ্তিময়

হয়ে ওঠে, অভিজ্ঞতার ধারা প্রবাহিত হয় এবং জীবনের পরিপক্কতা প্রকাশ পায়।

জীবনে এই পর্যায়ে প্রবীণরা হয়ে ওঠেন সফলতার মশাল, যা যুবসমাজের পথ আলোকিত করে এবং প্রজন্মের জন্য জীবনের ভিত্তি স্থাপন করে। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষীর অনুপ্রেরণা জোগান এবং নতুন উদ্যমে তাদের মনোবল জাগিয়ে তোলেন।

বার্ধক্য সত্ত্বেও আমলের ধারা থেমে থাকে না, দান বন্ধ হয় না; যতক্ষণ হৃদয় ঈমানের শক্তিতে জাগ্রত থাকে এবং ঈমান দ্বারা দৃঢ়সংকল্প পুনরুজ্জীবিত থাকে। এটি একটি মহান শিক্ষা যা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শিখেছি তাঁর এ বাণীর মাধ্যমে, 'যখন ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে আর এমতাবস্থায় তোমাদের কারো কাছে খেজুরের চারা থাকে, তাহলে সে যেন তা রোপণ করে'।[১]

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি মানুষকে উত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বিবেক ও দ্বীন দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি তাঁর ব্যাপক অনুগ্রহের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি তাঁর সম্মান ও তা'যীমের সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, যাকে তিনি হিকমাহ ও বিশুদ্ধ কিতাবের শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এবং তাঁর পরিবার ও ছাহাবীদের উপর ছালাত ও সালাম অবতীর্ণ করুন, যারা ছিলেন সঠিক দ্বীনের অনুসারী।

অতঃপর, আমি নিজেকে ও আপনাদেরকে তাক্বওয়া অবলম্বনের অছিয়ত করছি। শৈশব ও যৌবনের শক্তি, এরপর দুর্বলতা ও বার্ধক্য সবই মানুষের গড় আয়ুর সীমার মধ্যে আবর্তিত হয়। যেমন নবী ﷺ বলেছেন, 'আমার উম্মতের (গড়) আয়ু ৬০ থেকে ৭০ বছর। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই এ বয়স অতিক্রম করবে'।[২] বয়স সময়ের মানদণ্ডে একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ, যা এক অনিবার্য পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং প্রতিটি অতিবাহিত মুহূর্তের সাথে শেষ সময় ঘনিয়ে আসে।

হাদীছটি দুনিয়ার চাহিদা ও আখেরাতের প্রস্তুতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বান জানায় এবং সময়ের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করার তাগিদ দেয়। কারণ জীবন সীমিত আর সুযোগ আর ফিরে আসে না। জীবনের প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয় রেখে যাওয়া অমর চিহ্ন ও সৎ আমলের মাধ্যমে, বছরের সংখ্যা দিয়ে নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'উত্তম মানুষ সেই, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে আর সবচেয়ে মন্দ মানুষ সেই, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে; কিন্তু তার আমল খারাপ হয়েছে'।[৩]

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত কামনা করছি এবং এমন কথা ও আমলের তাওফীক্ব কামনা করছি যা আমাদের জান্নাতের নিকটবর্তী করবে। আমরা আপনার কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় কামনা করছি এবং যে কথা ও আমল জাহান্নামের নিকটবর্তী করে তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের জানা ও অজানা সকল বিষয়ের কল্যাণ কামনা করছি। আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের জানা ও অজানা সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাদের বিরুদ্ধে (শত্রুকে) অনুগ্রহ করবেন না। আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবেন না। আমাদের পক্ষে (শত্রুর বিরুদ্ধে) কৌশল করুন, আমাদের বিরুদ্ধে (শত্রুর পক্ষে) কৌশল করবেন না। আমাদেরকে হেদায়াত দিন, আমাদের জন্য হেদায়াতকে সহজ করুন। যারা আমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আজ ফিলিস্তীন এক ভয়াবহ দুর্যোগ ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, যা আপনার অবগতিতে রয়েছে এবং তা দূর করতে আপনিই সক্ষম।

হে আল্লাহ! আজ ফিলিস্তীনীদের উপর যে দুর্যোগ নেমে এসেছে তা থেকে তাদের উদ্ধার করুন। হে আল্লাহ! তারা আজ নগ্নপদে রয়েছে, তাদেরকে সক্ষম করুন। তারা আজ ক্ষুধার্ত, তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করুন। তারা আজ পোশাকহীন অবস্থায় রয়েছে, তাদের পোশাকের ব্যবস্থা করে দিন। তারা আজ নির্যাতিত, তাদের বিজয় দান করুন। হে আল্লাহ! আপনার শত্রু ও আমাদের শত্রু আগ্রাসনবাদী ইয়াহূদীদের উপর মুসলিমদের বিজয় দান করুন- আমীন!

১. আহমাদ, হা/১২৯০২; মুসনাদে বাযযার, হা/৭৪০৮, সনদ ছহীহ।
২. তিরমিযী, হা/২৩৩১, ৩৫৫০; ইবনু মাজাহ, হা/৪২৩৬, হাসান ছহীহ।
৩. তিরমিযী, হা/২৩৩০, ছহীহ লি-গায়রিহি।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আল-কুরআন

-মো. জোবাইদুল ইসলাম*

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও কুরাআনের তত্ত্ব কি পরস্পর সাংঘর্ষিক? কুরআন কি বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে? বর্তমানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বিজ্ঞান যে বিষয়ে আবিষ্কার করতে পারেনি আর কুরআন বহু আগেই সেই বিষয়ে বাতলে দিয়েছে সেটাকে আমরা বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করি। আসলে বিজ্ঞানীরা নিজেরাও স্বীকার করে যে, অনেক বিষয় তারা এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি। বিজ্ঞান ও কুরআন নিয়ে মানুষের কৌতূহল বরাবরের মতোই রয়েছে। আজ আমি আপনাদের কাছে অপ্রতুল জ্ঞান নিয়েই কুরআন ও বিজ্ঞান নিয়ে দুয়েকটি নমুনা পেশ করার প্রয়াশ পাব ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা ইয়াসীনের শুরুতে শপথ করে বলেছেন, ‘বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ’। আল-কুরআনে বৈজ্ঞানিক অনেক গূঢ় তথ্য আছে বলে আল্লাহ তাআলা কুরআন এর নাম ‘হাকীম’ রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সবকিছুর বর্ণনা দিয়েছেন। এজন্য মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ‘আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি’ *(আনআম, ৬/৩৮)*।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ ‘যারা কুফুরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; তবু কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩০)*।

বর্তমানকালের আধুনিক বিজ্ঞান অতি সাম্প্রতিককালে যে তত্ত্বকে ‘বিগব্যাং তত্ত্ব’ বলে আবিষ্কার করেছে, সেই তথ্য মহান আল্লাহ ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ ‘আকাশ আর যমীন এক সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩০)*। আধুনিক বিজ্ঞান দাবি করে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবকিছু একসাথে জমাট বেঁধে ছিল। এরপর প্রচণ্ড একটি বিস্ফোরণ হয় আর এই বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের সৃষ্টি হয়। বস্তুত তারা যদি কুরআনকে গবেষণা করত, তাহলে আরও অনেক আগেই এই ‘বিগব্যাং তত্ত্ব’ তারা আবিষ্কার করতে পারত। কুরআনের বর্ণিত আল্লাহর এই সৃষ্টিতত্ত্ব সর্বকালের সকল মানুষের জন্য একটি অনন্য উপমা। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ - ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ‘তোমার রব মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি গৃহ নির্মাণ করো পাহাড়, বৃক্ষ এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার করো, অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ করো। ওর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিষেধক। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য’ *(আন-নাহল, ১৬/৬৮-৬৯)*।

মৌমাছির আচরণ ও যোগাযোগের ওপর গবেষণার জন্য ১৯৭৩ সালে নোবেল পান ভন-ফ্রিচ। কোনো নতুন বাগান বা ফুলের সন্ধান পাওয়ার পর একটি মৌমাছি আবার মৌচাকে ফিরে যায় এবং মৌমাছি নৃত্য নামক আচরণের মাধ্যমে তার সহকর্মী মৌমাছিদেরকে সেখানে যাওয়ার সঠিক গতিপথ ও মানচিত্র বলে দেয়। অন্যান্য শ্রমিকমৌমাছিকে তথ্য দেওয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের আচরণ আলোকচিত্র ও অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আগে মানুষ ভাবত কর্মী মৌমাছিরা পুরুষ এবং ঘরে ফিরে এসে তাদেরকে একটি রাজা মৌমাছির কাছে জবাবদিহিতা করতে হয়। কিন্তু এটা সত্য নয়, কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা প্রমাণ করে শ্রমিক মৌমাছিরা স্ত্রী এবং তারা রাজা নয়, বরং রাণী মৌমাছির কাছে জবাবদিহিতা করে। মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি তাদের শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এ দুর্বল প্রাণীর জীবনব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকার মিল রয়েছে। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সেই হয় মৌমাছির শাসক। আল্লাহ তাআলা এসব বর্ণনা করার পর বলছেন, এগুলোর

* মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

মধ্যে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য। সুতরাং মানুষ যদি এ ছোট্ট প্রাণীকে নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে অনেক শিক্ষা অর্জন করতে পারবে (তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ, সূরা আন-নাহল, ১৬/৬৮-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

বিজ্ঞানী ভন-ফ্রিচ মৌমাছি নিয়ে যে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সে বিষয়ে মহান আল্লাহ ১৪০০ বছর আগে আল-কুরআনে বলে দিয়েছেন। কুরআনের এসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বড় বড় বিজ্ঞানীদেরকেও অবাক করে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ‘সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে’ *(ইয়াসীন, ৩৬/৪০)*। সূরা ইয়াসীনের এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরেকটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তা হলো চাঁদ, সূর্য নিজ নিজ কক্ষ পথে আবর্তন করে। এমনকি প্রতিটি গ্রহেরই একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথ রয়েছে আর সেগুলো সেই কক্ষপথেই আবর্তিত হয়। সুতরাং মহান আল্লাহ বলে দিলেন যে, তিনিই এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন এবং তাঁর নির্দেশেই সৌরজগতের সকল কিছু পরিচালিত হয়। যে তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে অল্প কিছু কাল আগে, তা মহান আল্লাহ অনেক আগেই বলে দিয়েছেন।

অতএব, একজন মুমিন-মুসলিম কিংবা একজন বিজ্ঞানী যখন রবের দেওয়া এই কালাম গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়বে, তখন রবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মাথা রবের সামনে সেজদায় নত করে দিবে।

“কীভাবে ইসলাম প্রকৌশল বিদ্যা শিখতে এবং প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে” প্রবন্ধটির বাকী অংশ

(৪) জ্ঞান অর্জনকে উপাসনা হিসেবে দেখা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরয’ *(ইবনু মাজাহ, হা/২২৪)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ ‘...তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন’ *(আল-মুজাদালাহ, ৫৮/১১)*।

(৫) মানবতার উপকারে সমস্যা সমাধান: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ‘আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয়, যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে’ *(সিলসিলা ছহীহা, হা/৯০৬)*।
প্রকৌশল বিদ্যা বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে মনোনিবেশ করে। যেমন- নবায়নযোগ্য শক্তি সিস্টেম, চিকিৎসা ডিভাইস ইত্যাদি আর এগুলো ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী মানবতার উপকারে আসে।

(৬) বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সেতুবন্ধন: ইসলাম বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে। প্রকৌশলীরা এই প্রেরণা খুঁজে পেতে পারে—

আল্লাহর সৃষ্টির সঠিকতা: এটি প্রকৃতির পেছনের গাণিতিক এবং শারীরিক নীতিগুলো অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করে। যেমন- চৌম্বক তরঙ্গ, সার্কিট তত্ত্ব ও সিগন্যাল প্রসেসিং। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ‘আর তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন; প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষপথে বিচরণ করে’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩৩)*।

আসমান-যমীনের আন্তঃসংযোগ: প্রকৌশল বিদ্যায় ডিজাইন করা আন্তঃসংযুক্ত সিস্টেমে প্রতিফলিত হয়। যেমন- শক্তি গ্রিড, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ ‘যারা কুফরী করে তারা কি দেখেনি যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি আর আমি সকল প্রাণবন্ত জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩০)*।

উপসংহার: ইসলামের শিক্ষার আলোকে প্রকৌশল বিদ্যা অধ্যয়ন শুধু একটি পেশাগত দক্ষতা অর্জন নয়, বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক এবং মানবিক দায়িত্বের মতো। ইসলাম বিজ্ঞান, নৈতিকতা এবং মানবকল্যাণের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে উৎসাহিত করে, যা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিদ্যার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে।

রামাযানের ইফতারী: কত নারীর দুশ্চিন্তার এক নাম

*-রাকিব আলী**

[১]

রামাযান মাসকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে স্ত্রীর বাপের বাড়ি থেকে ইফতারী খাওয়ার জঘন্য একটি রেওয়াজ চালু রয়েছে। এটা রীতিমতো যৌতুকের শামিল যা অনেক বড় এক সামাজিক ব্যাধি। এমন যৌতুক ভদ্রবেশে আদায় করা হয়। এটা যে কী পরিমাণ মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, তা একমাত্র ভুক্তভোগী নারীই বুঝতে পারে, বুঝতে পারে সেই নারীর বাপ-ভাইয়েরা। এটি একজন নারীর জন্য ভীষণ কষ্টের বিষয়। সে না মুখ ফুটিয়ে কিছু বলতে পারে, না সহ্য করে যেতে পারে। টপটপ করে চোখের পানি ফেলা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকে না। বুকের ভেতর তার জমাট বাঁধা কষ্টগুলো যেন চোখের অশ্রু হয়ে বের হয়।

অনেক সময় মেয়ে তার লজ্জা ভেঙে মনে কষ্ট নিয়ে মাকে ফোন করে বলে, মা! বাবাকে একটু বলে দিয়ো, তিনি যেন একটু বেশি করে ইফতারী নিয়ে আসেন। তা না হলে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাকে নানান কথা শুনাবে। এসব শুনে বাপ বেচারা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, মেয়ে তার পরিবারের কাছে ছোট হয়ে যাবে ভেবে ঋণ করে হলেও বুকে পাথর বেঁধে মেয়ের বাড়িতে ইফতারী নিয়ে যান। এদিকে বেয়াইয়ের বাড়ির লোকেরা তাদের জন্য আনা ইফতারের বাহারি ধরনের আইটেম সাজিয়ে বেয়াই সাহেবকে এমনভাবে আপ্যায়ন করেন, যেন তারা তাদের নীরব যুলম বুঝতেই পারল না। অথচ মেয়ের বাবা কতটা ক্ষত হৃদয় নিয়ে তাদের সাথে ইফতার করছেন তা যদি তারা নিজ চোখে দেখতে পেত, তবে তারা আঁতকে না উঠে পারত না। তখন তারা বুঝতে পারত তাদের যুলম কতটা ভয়ানক ছিল।

সমাজের কিছু কিছু নিচু মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ আছে, যারা তাদের ছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে রামাযানের শুরুর দিকে চাতক পাখির মতো ইফতারী পাওয়ার আশায় বসে থাকে। এমন চরম নির্লজ্জ ও ব্যক্তিত্বহীন মানুষেরা ইফতারী না আসলে ঘরের বউয়ের সাথে খোঁচা মেরে কথা বলে, নানান কষ্টদায়ক কথা শুনায়। দেরি হয়ে যাওয়ার নাম করে পরবর্তীতে দিলেও আর নিতে চায় না। অমুক বাড়ির অমুকের ইফতারী চলে এসেছে আর আমাদেরটার এখনো খবর নেই— এসব বলে ঘরের বউকে মানসিক কষ্টের মধ্যে রাখে। আহ, বেচারি লজ্জায় কিছু বলতেও পারে না। আসলে, কত বড় বেশরম ও আত্মমর্যাদাহীন হলে এসব লোকেরা এরকম ঘৃণিত আচরণ করতে পারে, ভাবা যায়?

[২]

ভাবুন তো, একজন মেয়েকে তার মা-বাবা জন্ম দিয়ে ছোট থেকে বড় করে তুললেন, পড়াশোনা করিয়ে শিক্ষিত করে তুললেন, বেড়ে উঠার পথে চিকিৎসা বাবদ যত খরচ লেগেছে, তার সবই বহন করলেন। মোটকথা, তার পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলেন। অতঃপর তাদের আদরের মেয়েটিকে একটা সময় বিয়ের মাধ্যমে স্বামীর হাতে তুলে দিলেন। এই যে তারা এত কষ্ট করে নিজে খেয়ে না খেয়ে মেয়েটার সকল ভরণপোষণ দিয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিলেন, এখন মেয়েটার কাছ থেকে কি তারা কোনো সার্ভিস নিচ্ছেন? এই মেয়েটা কি তার মা-বাবার পাশে থেকে তাদের সেবা করতে পারছে?

তাদের আদরের মেয়ের পিছনে এত কিছু বিনিয়োগ করেও তারা নিজেরা তার থেকে কোনো সার্ভিস গ্রহণ না করে আস্ত একটা মেয়েকে তার স্বামীর হাতে তুলে দিলেন। তারপর তার স্বামী সেই মেয়ের কাছ থেকে তার বাচ্চাকাচ্চা জন্ম দেওয়া ও দেখাশোনার সার্ভিস, বাচ্চাদেরকে শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার সার্ভিস, নিজের মা-বাবা এবং আত্মীয়দের দেখাশুনা করার সার্ভিস; সর্বোপরি, নিজের চরিত্র হেফাযতের সার্ভিসসহ সমস্ত প্রয়োজনীয় সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছে। এই এতকিছুর পরও আর কী চাই? এগুলো ভাবার বিষয় নয় কি? গাছ রোপণ করলেন মা-বাবা, সেটার পেছনে মেহনতও করলেন তারা। আর স্বামী সেটার ফল ভোগ করে যাচ্ছে। অথচ শ্বশুরবাড়ি থেকে বিভিন্ন সময়ে এটা সেটা পাওয়ার মানসিকতায় তার বড় অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

যে মা-বাবা তাদের মেয়েকে আপনার স্ত্রীর মর্যাদায় নিয়ে আসতে এত এত কষ্ট করলেন, সেই তাদের কাছে কি এটা সেটা চাইতে আপনার লজ্জা হওয়ার কথা নয়? আপনার সার্ভিসের উপযোগী করে তুলতে আপনার স্ত্রীর পেছনে তাদের এত আত্মত্যাগের পর কোন মুখে আপনি তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় বসে থাকেন? এতে আপনার ব্যক্তিত্ব কত সস্তাভাবে এক্সপোজ হচ্ছে— তা কি আপনি বুঝতে পারছেন না?

আপনি কখন আপনার শ্বশুর-শাশুড়িকে সম্মান করলেন, জানেন? শ্বশুর-শাশুড়িকে কেবল সালাম আর ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করাতেই সম্মান করা হয়ে যায় না। তাদেরকে আপনার তখনই সম্মান করা হবে, যখন আপনি তাদের মেয়েকে দিয়ে তাদের নিকট এটা সেটা চাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। যৌতুক থেকে বাঁচিয়ে দেওয়াই তাদের প্রতি আপনার বড় সম্মান।

* আম্বরখানা, সিলেট।

[৩]

আপনি কি কাউকে ভালোবেসে সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে পারবেন? পারবেন না। কিন্তু আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর ভালোবাসা এতটাই গভীর যে, সে তার সকল আপনজন ছেড়ে আপনার কাছে চলে এসেছে। আপনাকে সে কত বেশি ভালোবাসে, আপনাকে সে কত বেশি আপন করে নিয়েছে, সেটা বোঝার জন্য তার সকল প্রিয়জনকে ছেড়ে আপনার কাছে চলে আসার মহান ত্যাগই যথেষ্ট। এরপরও কি আপনি স্বামী তার মূল্য বুঝবেন না? তার আবেগ বুঝবেন না?

যে মেয়ে একসময় তার মাকে ছাড়া থাকতেই পারত না, যে মেয়ে তার নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য বাড়িতে গিয়ে থাকা কমফোর্ট ফিল করত না, সেই মেয়ে আজ আপনার কাছে দিনের পর দিন অনায়াসে থাকছে, সেই মেয়ে আপনার বাড়িকে তার কমফোর্ট জোন বানিয়ে নিয়েছে। এরপরও বুঝবেন না আপনার প্রতি তার ভালোবাসা? আপনার প্রতি যার এত ভালোবাসা, তাকে কীভাবে তার বাপের বাড়ি থেকে কৌশলে এটা সেটা এনে দেওয়ার কথা বলে মানসিক কষ্টে রাখতে পারেন? কীভাবে পান থেকে চুন খসলেই তার গায়ে হাত তুলতে পারেন? একটুও কি তার প্রতি আপনার মায়া হয় না? তার এত ত্যাগ কি আপনার একটুখানি ভালোবাসা পাওয়ার দাবি রাখে না?

চিন্তা করুন তো, আপনার মেয়েকে যদি তার স্বামী বাপের বাড়ি থেকে এটা সেটা আনার কথা বলে, তবে আপনার কেমন লাগবে? পারবেন কি মেয়ের কষ্ট সহ্য করতে? পারবেন না। এখন যে কষ্ট আপনি আপনার মেয়ের বেলায় চিন্তাও করতে পারেন না, সে একই কষ্ট আপনি কেন অন্যের মেয়েকে দিবেন? আপনি যদি আপনার নিজের মেয়ের বেলায় ইনছাফ আশা করেন, তবে অন্যের মেয়ের সাথে কেনো বে-ইনছাফ করবেন?

যে আপনি নিজের কোনো কিছুর বেলায় ইনছাফের কথা বলেন, সে আপনি নিজেই কি অন্যের সাথে ইনছাফ করছেন? অন্যের বেলায় যদি ইনছাফ না করা হয়, তবে নিজের বেলায় ইনছাফ আশা করা কতটা যৌক্তিক নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন তো।

[৪]

কখনো স্ত্রীর সাথে এমন ব্যবহার করবেন না, যে ব্যবহারে সে আপনার অনুপস্থিতি কামনা করে, যে ব্যবহারের কথা মনে করে তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু পড়ে, তার মনের বার্তা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আপনার স্ত্রীর সাথে এমন ব্যবহার করুন, যে ব্যবহার আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার ভালোবাসার স্মরণ তাকে ভীষণ কাঁদায়। যে ব্যবহারে সে ছালাত আদায় করে রবের কাছে আপনাকে তার জীবনে পাওয়ার শুকরিয়া আদায় করে।

স্ত্রীকে আপনার তখনই ভালোবাসা হবে, যখন আপনি তার বাপের বাড়ি থেকে এটা সেটা এনে দেওয়ার কথা বলে মানসিক কষ্টে রাখবেন না। স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালোবাসার গভীরতা তখনই বোঝা যাবে, যখন আপনি আপনার স্ত্রীকে কাছে টেনে এনে বলবেন, দেখো! তুমি ইফতারী নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করো না। ঘরের সবাইকে আমি বিনয়ের সাথে বুঝাব যে, আমরা কোনো ইফতারী নেব না। তোমার কাছে আমার একটাই চাওয়া। আর সেটা হচ্ছে, যে রব আমাকে তোমার মতো পরম নেয়ামত দিয়েছেন, সেই রবের ইবাদত-বন্দেগীতে তুমি সময় কাটাও। রবের সন্তুষ্টি ঘিরে তোমার সকল চিন্তা হোক; ইফতারীকে ঘিরে নয়।

আপনার আচরণ যেন এমন না হয়, যে আচরণ দেখে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আহ! এ আমরা কার কাছে মেয়েটাকে বিয়ে দিলাম। এমনকি মাথায় হাত রেখে যেন আক্ষেপের স্বরে না বলে, হায়! এমন মানুষের কাছে আমাদের মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটা জীবনের বড় এক ভুল ছিল।

পক্ষান্তরে, নিজের চরিত্রকে সেইভাবে উন্নত করুন, আপনার যে চরিত্র দেখে বিয়ের পর আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মনে বড় আনন্দ নিয়ে বলে যে, এই মানুষটির কাছে আমাদের মেয়ে বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্তটা জীবনের অনেক বড় এক ভুল হয়ে যেত। রবের কাছে অসংখ্য শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে এমন মানুষের কাছে বিয়ে দেওয়ার মতো বড় ভালো একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাওফীক্ব দিয়েছিলেন। আল-হামদুলিল্লাহ!

[৫]

সমাজে যখন স্ত্রীর বাপের বাড়ি থেকে ইফতারী খাওয়ার রীতি চালু রয়েছে, তখন আপনি সে প্রথাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আপনার স্ত্রীকে একটি সারপ্রাইজ দিতে পারেন। জানেন সেটা কী? সেটা হচ্ছে, আপনি আপনার স্ত্রীকে হাসিমুখে গিয়ে বলবেন, চলো! আমরা একদিন আমার শ্বশুরবাড়িতে তাদের জন্য কিছু ইফতার সামগ্রী নিয়ে তাদেরকে দেখে আসি।

যে শ্বশুর-শাশুড়ির কারণে তোমার মতো একজন স্ত্রী আমি অধম পেয়েছি, যে শ্বশুর-শাশুড়ির সুধারণার কারণে আমি তোমার স্বামী হতে পেরেছি, সেই তাদের সাথে কিছু সুন্দর সময় কাটিয়ে আসি, সেই তাদের দু'আ নিয়ে আসি।

এভাবে বললে কী হবে, জানেন? এভাবে সুন্দর ভাষায় মহব্বত নিয়ে মন থেকে বললে দেখবেন আপনার স্ত্রী আপনার উপর অনেক খুশি হবে। সে এক অন্য লেভেলের খুশি। তখন তার মাথা থেকে তার বাবার বাড়ি থেকে ইফতারী নিয়ে আসার মহা টেনশন দূর হবে। যে দুশ্চিন্তার ভারে সে মানসিকভাবে নুইয়ে পড়ছিল, সেটা নিমিষেই দূর হয়ে যাবে আপনার চমৎকার একটি কথাতেই। সে যে কী খুশি হবে, তা একবার করেই দেখুন না। বিশ্বাস করুন, তার খুশি দেখে আপনি হৃদয়ে অন্যরকম এক প্রশান্তি অনুভব করবেন। এছাড়া, আপনার প্রতি তার সম্মান, কেয়ারিং, ভালোবাসা আরও বহুগুণ বেড়ে যাবে। স্ত্রীর সাথে এমন সুন্দর দৃশ্য দেখে আল্লাহও অনেক খুশি হবেন। আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার সম্মান আরও বাড়িয়ে দেবেন। আর কারো দুশ্চিন্তা দূর হয়, এমন কিছু করায় আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনারও দুনিয়া-আখেরাতের সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন।

রামাযানের প্রস্তুতি

*-সীমা বিনতে সিরাজুল ইসলাম**

আবির ও জামিল একই গ্রামে বাস করত। আবিরের বাবা তাকে বড় আলেম বানানোর ইচ্ছে নিয়ে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জে ভর্তি করান, ফলে ছোটবেলাতেই আবিরকে গ্রাম ছাড়তে হয়। অন্যদিকে, জামিল গ্রামের স্কুলেই পড়াশোনা করে। আবির বছরে তিনবার বাড়ি এলেও কেবল তখনই তাদের দেখা হয়। এবার রামাযান উপলক্ষ্যে ছুটিতে বাড়ি ফিরে আবিরের সঙ্গে জামিলের সাক্ষাৎ হয়।

আবির: আস-সালামু আলাইকুম, বন্ধু! কেমন আছিস?

জামিল: ওয়া আলাইকুমুস সালাম। আল-হামদুলিল্লাহ। তুই কেমন আছিস?

আবির: আল-হামদুলিল্লাহ। আমিও ভালো আছি। বন্ধু, সামনে রামাযান! তুই ছিয়াম রাখবি না?

জামিল: রাখব তো। কিন্তু ছিয়াম বলতে কি তুই রোযাকে বুঝিয়েছিস?

আবির: হ্যাঁ, ছিয়াম বলতে রোযাকে বুঝিয়েছি এবং ছিয়াম বলাই শ্রেয়।

জামিল: আবির, তুই তো মাদরাসায় পড়িস, আমাকে রামাযানের বিধিবিধান সম্পর্কে একটু জানাবি?

আবির: অবশ্যই! আমি তোকে রামাযানের আগের কিছু করণীয় এবং রামাযানের মধ্যবর্তী সময়গুলোর কিছু করণীয় বিষয়গুলো জানানোর জন্যই তো এসেছি। আমার উস্তায আব্দুল আলীম ইবনু কাওছার মাদানী হাফিযাহুল্লাহ, তিনি রামাযান মাস সম্পর্কে খুব সুন্দর একটা আলোচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন, রামাযানে প্রস্তুতিমূলক আমরা কী কী করব? সেগুলো তোকে বলি— (১) রামাযান মাস আসার আগেই রামাযান মাস পাওয়ার জন্য অধিকতর দু'আ করতে হবে। (২) ক্বাযা ছিয়াম থাকলে রামাযান মাসের আগেই ক্বাযা আদায় করে নিতে হবে। (৩) লিখিত একটি কর্মসূচি তৈরি করতে হবে।

জামিল: লিখিত সূচি তৈরি করতে হবে?

আবির: আচ্ছা বন্ধু! একটু ধৈর্য ধর, আমি তোকে সব বুঝিয়ে বলব।

জামিল: ঠিক আছে, তুই তাহলে বল।

আবির: লিখিত সূচি বলতে সেটাতে এমন কিছু আমল লিখা থাকবে, যেগুলো আমরা অন্যান্য মাসেও পালন করব, তবে রামাযান মাসে তার তুলনায় অধিক বেশি পালন করব। সেগুলো হলো— (১) তারাবীর ছালাত নিয়মিত আদায় করতে হবে। (২) ছিয়াম রাখার প্ল্যান করতে হবে। (৩) আল-কুরআন পড়তে হবে। (৪) দান-ছাদাক্বা করতে হবে। (৫) ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাতে হবে।

জামিল: মাশা-আল্লাহ! লিখিত সূচিটা খুব সুন্দর হয়েছে। এটা অনুযায়ী আমি রামাযান মাস অতিবাহিত করার চেষ্টা করব, ইনশা-আল্লাহ! তবে বন্ধু! একটা বিষয়ে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।

আবির: কী চিন্তা হচ্ছে? কোন বিষয়ে?

জামিল: কুরআন পড়া নিয়ে। ৩০ পারা কুরআন আমি কীভাবে শেষ করব?

আবির: বন্ধু! চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। কুরআন শেষ করার একটা সহজ টেকনিক আমি তোকে শেখাব, যদি তুই নিয়মানুযায়ী কুরআন পাঠ করিস; তাহলে তুই অবশ্যই অন্তত একবার কুরআন শেষ করতে পারবি।

জামিল: সত্যি বলছিস বন্ধু!

আবির: হ্যাঁ, সত্যি বলছি। জামিল! তুই তো জানিস যে, কুরআন ৩০ পারা, যার প্রত্যেক পারায় ২০টি করে পৃষ্ঠা আছে। কোনো ব্যক্তি যদি প্রত্যেক ৫ ওয়াক্ত ছালাতের পর (ফজরের পর, যোহরের পর, আছরের পর, মাগরিবের ছালাতের পর এবং এশার ছালাতের পর) ৪ পৃষ্ঠা করে কুরআন পড়ে, তাহলে সে দৈনিক (৪×৫)=২০ পৃষ্ঠা অর্থাৎ ১ পারা কুরআন পড়তে সক্ষম হবে।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত নিয়ম অনুযায়ী কুরআন পাঠ করে, তবে অবশ্যই সে ৩০ দিনে ৩০ পারা কুরআন পাঠ করতে সক্ষম হবে আর এটা তার জন্য কষ্টকর হবে না বলেও আমি আশা করি।

জামিল: মাশা-আল্লাহ! কতই না সুন্দর এই নিয়ম! আমি অবশ্যই এই নিয়মানুযায়ী কুরআন পড়ব, ইনশা-আল্লাহ! এমনকি আমার পরিবার এবং আত্মীয়স্বজন সবাইকে এ সহজ টেকনিক শিখিয়ে দিব, ইনশা-আল্লাহ!

দুই বন্ধু আলোচনা শেষ করে বিদায় নেয়। পরদিন জামিল তার পরিবারের সদস্যদের কুরআন পড়ার সহজ টেকনিক শেখায়, যা শুনে তার বাবা-মা আনন্দিত হন এবং সিদ্ধান্ত নেন, এ বছর তারা অন্তত একবার কুরআন খতম করবেন। রামাযান শুরু হলে জামিল আবিরের উপদেশ অনুসরণ করে মাসটি অতিবাহিত করে এবং উপলব্ধি করে, প্রতিটি পরামর্শই ফলপ্রসূ হয়েছে। কৃতজ্ঞচিত্তে সে আল্লাহর কাছে দু'আ করে, 'হে আল্লাহ! আমার বন্ধু আবিরকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন' —আমীন!

শিক্ষা:

উক্ত গল্প থেকে দুটি বিষয়ে আমরা শিক্ষা নিতে পারি—

১. জীবন চলার পথে একজন বন্ধুর খুবই প্রয়োজন, তবে অবশ্যই তাকে হতে হবে আতরওয়ালার মতো অর্থাৎ সৎ বন্ধু।

২. কেউ যদি উপরে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী রামাযান মাস অতিবাহিত করে, তবে আশা করা যায় যে, সে জামিলের মতো সফল হবে, ইনশা-আল্লাহ!

* ছানাবিয়্যাহ ২য় বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (বালিকা শাখা), ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

রামাযানের নূর

-সীমা বিনতে সিরাজুল ইসলায়
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (বালিকা শাখা),
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

বছর শেষে আবার আসছে
রহমতেরই মাস,
মুমিন-মুত্তাক্বী করবে ইবাদত
হয়ে আল্লাহর দাস।
রামাযান আসে আনন্দ নিয়ে
মুমিন-মুত্তাক্বীর অন্তরে,
ইবাদত আর যিকির করে
একমাস টানা ধরে।
সাহরী হয় ইফতার হয়
আরও হয় তারাবী,
এ ছালাত আদায় করে
পাবে জান্নাতেরই চাবি।
ছিয়াম হলো এমন বিধান
যার হয় না কোনো তুলনা,
নিজ হাতে যার প্রতিদান করবেন দান
তার নেই কোনো কল্পনা।
ছিয়াম হলো ফরয বিধান
মানতে তোমায় হবে,
না মানলে জীবন তোমার
ধ্বংসের দিকে যাবে।

রামাযানের চাঁদ উঠলে

-আনিছুর রহমান
নামাজগড়, বগুড়া।

রামাযানের চাঁদ উঠলে,
মুসলিম মনে আনন্দ ঝরে।
কাফের, যালেম থাকে বেজার,
ছিয়াম ভঙ্গ হলে গুনাহ ভরে।
চাঁদ দেখেই দু'আ পড়ে,
তারাবীতে শামিল হয় সবে।
এশার ছালাতে দল বেঁধে,
মসজিদমুখী হয় সবে।
ইমামের পিছনে তারাবী পড়ে,
সাহরীতে নেয় বরকত ভরে।
কুরআন-হাদীছ পাঠে মন রবে,
ধনী-গরীব সবাই ছিয়াম রাখে।
গীবত, হিংসা, লোভ-দ্বেষ,
ছিয়ামের ছোঁয়ায় হয় নিরুদ্দেশ।
সূর্য ডুবলে খুশির সাথে,
ইফতার নেয় সবাই হাতে।
নেকীর মাস রামাযান আসে,
রহমত-বরকতে জীবন হাসে।
নরক থেকে মুক্তি চেয়ে,
জান্নাতের কামনা করি রবে।

দাবানল

-মো. রাফি উদ্দিন মুনির
শিক্ষার্থী, নোয়াখালী কারামাতিয়া কামিল মাদরাসা,
সোনাপুর, সদর, নোয়াখালী।

দাবানলের ছোবলে পুড়ল সব, হলো স্তব্ধ,
প্রভুর শাস্তি—কঠিন, কঠোর, বিধিবদ্ধ।
সবুজ-শ্যামল তরুলতা, গাছের স্নিগ্ধ ছায়া,
পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা হারালো সবই মায়া।
দাউ দাউ আগুনে লাল হলো ভূবন,
নদীর পানিও নিভাতে পারল না সেই অনল।
হলিউডের ঐশ্বর্য, তারকা-দ্বীপ,
চূর্ণ হলো মুহূর্তেই, বিলীন হলো সম্পদ বিপুল।
গাযাবাসীর সাজানো শহর—এখন ছাই,
যারা একদিন রাজার মতো দাঁড়িয়েছিল ভাই।
ফিলিস্তীনে নির্যাতনে ছিল যারা পাশে,
আমার ভাই মরলে তারা অনলাইনে হাসে!
ইসরাঈলের সঙ্গী যারা, করল যে পক্ষপাত,
মা-বোনের সতীত্ব কেড়ে নিল অবলীলায়।
শিশুগুলো মৃত্যুমুখে, ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদে,
তাদেরই এখন ত্রাণ নিতে দ্বারে দ্বারে বাধে।
পরকালের ভয় নেই, তবু দেখো এই কাল,
এই দুনিয়ায়ও তো হারাচ্ছ তুমি কতকাল!
মাযলূমের দু'আ থামে না, বাজে ফের আকাশে,
এই দিন শেষ নয়, বিচার হবে আবার শেষে!

ছালাত

-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ
অধ্যয়নরত, আক্বীদা ও দাওয়াহ বিভাগ,
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
ছালাত পড়তে যাই,
রাস্তাঘাটে বসে থাকলে
কোনো লাভ নাই।
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়লে
ভালো থাকে মন,
এসো আমরা ছালাত পড়ে
ধন্য করি জীবন।
ছালাতের কথা রেখো স্মরণ
সফল হবে জীবন,
সামনে তোমার নেই বেশি দিন
আসবেই তো মরণ।

লাশখেকো

-ইবনু মাসউদ
শিক্ষার্থী, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী, গাজীপুর।

স্বাধীনতা মরে গেছে
পলাশীর ফিরিঙ্গির কাছে।
ফিরিঙ্গিরা আনল একাত্তর
একাত্তরও ক্ষুধায় কাতর!
পলাশী তুমি তিতুমীর
একাত্তর তুমি লাশের ক্ষীর!
পলাশী একাত্তরের মতো
সব যেন লাশের বিপ্লব।
চব্বিশ তুমি যতই বলো
তুমি নব্য লাশের বিপ্লব!
মুগ্ধের পানি, আবু সাইদের বুক
বদলাতে পারেনি পূর্ণ ফ্যাসিবাদ।
জুলাই গ্লানি, জুলাই যেন শোক!
তবে, ফিরছে কেন নব্য ফ্যাসিবাদ?
লাশের রক্ত মাখা বিপ্লব মঞ্চে
গগণচুম্বী ধিক্কার উঠে—
হে আমার মাতৃভূমি
তুমি লাশখেকো উন্মাদ।
বারবার লাশ নিয়ে
তুমি স্বাধীনতা করো বরবাদ।

রামাযান

-মইন আলী
শিক্ষার্থী, পালপুর ধরমপুর মহাবিদ্যালয়,
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

রামাযান হোক রহমতের
রামাযান হোক আশার
রামাযান হোক বরকতের
রামাযান হোক দিশার।
রামাযান হোক নাজাত পাওয়ার
রামাযান হোক প্রীতির
রামাযান হোক শান্তি-সুখের
রামাযান হোক ভীতির।
রামাযান হোক ছালাত-ছিয়াম
রামাযান হোক ক্বিয়ামের
রামাযান হোক শুকর-যিকির
রামাযান হোক অন্তরের।
রামাযান হোক সবার তরে
রহমতেরই আলো
রামাযান হোক আলোর দিশা
রামাযান হোক ভালো।

প্রকৃতি

-শাহরিয়ার আরিফ সিয়াম
ছাত্র, সপ্তম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

বাতাসে ভেসে আসে মায়াবী ঘ্রাণ,
মুগ্ধ করে মন, জুড়ায় প্রাণ।
সোনালি ধানের মাঠে মেলে পরাণ,
নদীর কলকল ধ্বনি গেয়ে ওঠে গান।
নৌকার ছলাৎ ছলাৎ শব্দের তালে
রৌদ্র হাসে গাছপালার কোলে।
মাঠের কৃষাণ ঘামে ভেজা গায়
মিলিয়ে যায় সুর প্রকৃতির দূর নিরালায়।
স্নিগ্ধ ভোরে পাখির কলতান,
জাগায় মনে জীবনের গান।
পড়ন্ত বিকেলের রক্তিম আভায়
প্রকৃতির রূপ ঝলমল করে গগনে ভাসায়।
রাত্রি নামলে নক্ষত্রের আলো,
প্রকৃতি ঢেকে যায় মায়ার কালো।
তবু তার মাঝে সৌন্দর্য ফুটে,
অপরূপ প্রকৃতি হৃদয়ে ছুটে।

বাংলাদেশ সংবাদ

ইমাম-মুয়াজ্জিনরা পাচ্ছেন ভাতা

দেশের প্রায় সাড়ে তিন লাখ মসজিদের ১৭ লাখ ইমাম-মুয়াজ্জিনকে সম্মানী ভাতা দেবে অন্তর্বর্তী সরকার। পাশাপাশি মসজিদের খাদেমদেরও দেওয়া হবে এই ভাতা। প্রাথমিকভাবে ইমাম পাঁচ হাজার, মুয়াজ্জিন চার হাজার এবং খাদেম তিন হাজার টাকা করে পারেন। শুরুতে দেশের মোট মসজিদের ১০ শতাংশ মসজিদে প্রথম দফায় এ কর্মসূচি চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে বাকি মসজিদগুলোকেও এই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। গত ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং, রোজ মঙ্গলবার ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ইফা) সারা দেশের মসজিদগুলোর তালিকা করতে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে। মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ যুগোপযোগী করা এবং গত বছরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সরকার থেকে সম্মানী প্রদান করা হবে বলে কমিটি গঠনের অফিস আদেশে বলা হয়েছে। কমিটির প্রধান করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির সচিব মহোদয়কে। কমিটির প্রধান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন বলেন, 'সারা দেশে অন্তত সাড়ে তিন লাখ মসজিদ রয়েছে। এসব মসজিদে ১৭ লাখের বেশি ইমাম ও মুয়াজ্জিন রয়েছেন। এর বাইরে শহরের মসজিদগুলোতে খাদেম রয়েছেন। সরকার পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম দফায় দেশের ১০ শতাংশ মসজিদে এ কর্মসূচি চালু করবে। পরে ধাপে ধাপে সব মসজিদ এর আওতায় আসবে। কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি মসজিদকে ১২ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে'।

ভারতের দখলে থাকা ৫ কিলোমিটার নদী উদ্ধার করল বিজিবি

৬ জানুয়ারি ২০২৫ ইং, সোমবার সন্ধ্যায় ৫৮ বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় যে, কোদালিয়া নদী বাংলাদেশের অভ্যন্তর হতে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে মহেশপুরের মাটিলা এলাকায় ৪.৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চিহ্নিত করেছে। ১৯৬১ সালে প্রণীত বাংলাদেশ-ভারত (স্টিপ ম্যাপ সিট নম্বর-৫১) মানচিত্র অনুসারে কোদলা নদীর উল্লিখিত ৪.৮ কিলোমিটার নদী সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সীমান্তের শূন্য রেখার অভ্যন্তরে অবস্থিত। কোদালিয়া নদীর প্রকৃত মালিকানা-সংক্রান্ত এই বিষয়টি ৫৮ বিজিবির নজরে আসে। এরপর বিজিবি প্রথমে বিভিন্ন নথিপত্র স্থানীয় প্রশাসন ও মানচিত্র থেকে নদীটির প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত করে বিএসএফের অবৈধ আধিপত্য বিস্তারের বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। পরে ৫৮ বিজিবির সদস্যরা সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কোদালিয়া নদী নিজেদের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতার পর কোদালিয়া নদী পাড়ের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে বাংলাদেশের আরও অভ্যন্তরে বসবাস শুরু করলে কোদালিয়া নদীর বাংলাদেশ অংশটুকু ভারতের বিএসএফ দখল করে নেয় এবং সেখানে আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে কৃষকরা মাঠে চাষাবাদ ও নদীতে মাছ ধরতে যেতে পারতেন না। নদীর বাংলাদেশ অংশে প্রয়োজনীয় সেচ এবং চাষাবাদ চালু রাখার জন্য গ্রামবাসীকে বিজিবি অনুরোধ জানান। এক্ষেত্রে কখনো কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি হলে তা সঙ্গে সঙ্গে বিজিবিকে অবহিত করতেও গ্রামবাসীর প্রতি বিজিবি সদস্যরা অনুরোধ জানান।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

যুক্তরাষ্ট্রে লিঙ্গ হিসেবে শুধু নারী-পুরুষকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে : ট্রাম্প

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু দুটি লিঙ্গ পুরুষ এবং নারীকে স্বীকৃতি দেবে, যা অপরিবর্তনীয়। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এমনই মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত জানুয়ারি মাসে শপথ নেওয়ার পর তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। সেখানে ট্রান্সজেন্ডারদের বিষয়টি তোলেন ট্রাম্প। ট্রাম্প এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন নীতিমালা দ্রুত বাতিল করার জন্য নির্দেশ দেন। হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা জানান, নতুন এই নির্বাহী আদেশের ফলে ফেডারেল সরকারকে 'জেন্ডার' শব্দটির পরিবর্তে 'সেক্স' শব্দটি ব্যবহার করতে হবে এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগকে পাসপোর্ট, ভিসাসহ সরকারি নথিতে সঠিকভাবে লিঙ্গ প্রতিফলিত হয় তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প বলেন, 'আজকে, এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের আনুষ্ঠানিক নীতি হবে এখানে

(যুক্তরাষ্ট্রে) শুধু দুই লিঙ্গের মানুষ আছেন— নারী ও পুরুষ'। দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক ঘণ্টা পরেই ট্রাম্প দ্রুত বাইডেন প্রশাসনের প্রণীত নীতিগুলো প্রত্যাহারের প্রচারণার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে এগিয়ে আসেন। ট্রাম্প জো বাইডেন স্বাক্ষরিত ৭৮টি নির্বাহী আদেশ বাতিল করেন, যার মধ্যে বর্ণগত সমতা সমর্থন, সমকামী ও ট্রান্সজেন্ডারদের বিরুদ্ধে বৈষম্য মোকাবেলায় কমপক্ষে ১২টি ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০২২ সালে মার্কিনদের পাসপোর্টে ট্রান্সজেন্ডারদের লিঙ্গ হিসেবে 'এক্স' লেখার সুযোগ দিয়েছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব গ্রহণের পর ট্রাম্প এবার তার নির্বাহী আদেশে লিঙ্গ হিসেবে শুধু নারী ও পুরুষকে স্বীকৃতি দেওয়ায়; এই সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য যেসব সরকারি কার্যক্রম রয়েছে, সেগুলোতেও অর্থায়ন বন্ধ হয়ে যাবে। ট্রাম্প কৃষ্ণাঙ্গ, হিস্পানিক, আদিবাসী আমেরিকান, এশিয়ান আমেরিকান এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের সাহায্য করার লক্ষ্যে অন্যান্য আদেশও বাতিল করেছেন। গত বছরই নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় ট্রাম্প জানিয়ে রেখেছিলেন, নারীদের খেলায় ট্রান্সজেন্ডারদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করবেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের অ্যাথলেটেরা সাধারণত নারীদের ইভেন্টে অংশ নিয়ে থাকেন। এদিকে, এলজিবিটিকিউ আমেরিকানদের পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী নাগরিক অধিকার সংস্থা ল্যাম্বডা লিগ্যালের প্রধান আইন কর্মকর্তা জেনিফার পাইজার বলেছেন, তার সংস্থা ও অন্যরা এই নির্বাহী পদক্ষেপের জন্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করবেন বলে তিনি প্রত্যাশা করেন।

মুসলিম বিশ্ব

ইসরাঈলের কারাগার থেকে মুক্ত ২০০ ফিলিস্তীনি

ইসরাঈল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী ইসরাঈলি দুই কারাগার থেকে ২০০ ফিলিস্তীনি বন্দী মুক্তি পেয়েছেন। এর আগে চার ইসরাঈলি নারী সেনাকে মুক্তি দেয় হামাস। ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং, রোজ শনিবার এই ফিলিস্তীনি ও ইসরাঈলিরা মুক্তি পান। ইসরাঈলের অধিকৃত পশ্চিম তীরের অফার কারাগার ও নেগেভ মরুভূমির কাজিয়ত কারাগার থেকে ২০০ ফিলিস্তীনিকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্ত হওয়া ফিলিস্তীনিদের মধ্যে বিভিন্ন বয়সী নারী ও পুরুষ রয়েছেন। কাতার, মিসর ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় গাযায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। এর মধ্য দিয়ে ১৫ মাসের এ যুদ্ধের আপাতত ইতি ঘটেছে। এরপর দ্বিতীয় দফায় ফিলিস্তীনি ও ইসরাঈলিরা মুক্তি পেলেন। এর আগে প্রথম দফায় হামাস তিন যিম্মীকে ছেড়ে দেয়। এর বদলে ইসরাঈলের কারাগারগুলো থেকে মুক্তি পান ৯০ জন ফিলিস্তীনি বন্দী। যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় ধাপে ধাপে হামাস যিম্মীদের ছেড়ে দেবে। পাশাপাশি ফিলিস্তীনি বন্দীদেরও মুক্তি দেবে ইসরাঈল। ফিলিস্তীনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরাঈলি ভূখণ্ডে হামলা চালায় । ওই হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত হন। যিম্মী করে গাযায় নেওয়া হয় ২৫১ জনকে। ওই দিনই গাযা উপত্যকায় নৃশংস হামলা শুরু করে ইসরাঈলি বাহিনী। এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে গাযায় ৪৭ হাজার ২০০ জনের বেশি ফিলিস্তীনি নিহত হয়েছেন। তাদের বেশির ভাগই বেসামরিক মানুষ।

গাযায় ১৩ হাজারের বেশি শিশু নিহত, ২৫ হাজার আহত : জাতিসংঘ

গাযায় গত ১৫ মাসব্যাপী ইসরাঈলি আগ্রাসন শিশুদের জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে এনেছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, সেখানে ১৩ হাজারেরও বেশি শিশু নিহত হয়েছে, আনুমানিক ২৫ হাজার শিশু আহত হয়েছে এবং কমপক্ষে ২৫ হাজার শিশু অপুষ্টির কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ব্রিটেনের উপ-জাতিসংঘ দূত জেমস কারিউকি নিরাপত্তা পরিষদে সম্প্রতি বলেছিলেন, গাযা এখন বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান শিশুদের জন্য। তিনি আরও বলেন, গাযার শিশুরা এই যুদ্ধ বেছে নেয়নি, তবুও তারা এর সবচেয়ে বড় মূল্য দিয়েছে। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয় অফিস (ওসিএইচএ) বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, গাযায় এখন পর্যন্ত ৪০ হাজার ৭১৭ জন নিহত ফিলিস্তীনির মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ১৩ হাজার ৩১৯ জন শিশু। এই তথ্য গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া গেছে। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ জানিয়েছে, তাদের তথ্য অনুযায়ী গাযার ২৫ হাজার শিশু আহত হয়েছে। এই তথ্য গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তারা সংগ্রহ করেছে। জাতিসংঘের উপ-মহাসচিব

আমিনা মোহাম্মদ বলেন, ডিসেম্বরের আগে চার মাসে প্রায় ১৯ হাজার শিশু মারাত্মক অপুষ্টির কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। এই তথ্যও ইউনিসেফের, যা গাযার জাতিসংঘ কর্মীদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পাওয়া গেছে, যেখানে সকল সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর সমন্বয় ছিল। জাতিসংঘ জানায়, হাজার হাজার শিশু এতদিনে এতটুকু হারিয়েছে যে তারা এখন অনাথ বা তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জাতিসংঘের এডুকেশন ক্যানট ওয়েট ফান্ডের নির্বাহী পরিচালক ইয়াসমিন শারিফ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ৬ লাখ ৫০ হাজার স্কুল-যোগ্য শিশু এখনো ক্লাসে যাচ্ছে না এবং গাযার শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি পুনর্গঠন করতে হবে, কারণ সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

গাছের অবস্থা দেখে অগ্ন্যুৎপাতের আগাম তথ্য

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঠিক পূর্বাভাস করা বেশ কঠিন। অগ্ন্যুৎপাতের আগে আগ্নেয়গিরির আশপাশের ভূপৃষ্ঠের নিচে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। আর তাই বর্তমানে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে সম্ভাব্য অগ্ন্যুৎপাত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। তবে আগ্নেয়গিরির আশপাশে থাকা গাছ পর্যবেক্ষণ করেও অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব বলে দাবি করেছেন কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী। অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস জানার প্রাকৃতিক উপায় খুঁজে পেতে রবার্ট বোগের নেতৃত্বে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, আগ্নেয়গিরির কারণে আশপাশে থাকা গাছের শেকড়ে পরিবর্তন আসে, যা গাছের বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় গাছগুলোর সালোকসংশ্লেষণের কার্যক্রমে বেশ পরিবর্তন ঘটে যায়। অনেক সময় পাতার গঠনেও পরিবর্তন আসে। অগ্ন্যুৎপাতের কয়েক মাস আগে গাছের টিস্যুতে এসব পরিবর্তন দেখা যায়। এর ফলে আগ্নেয়গিরির আশপাশে থাকা গাছ পর্যবেক্ষণ করে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাব্য ঝুঁকি অনুমান করা সম্ভব। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ও মাটির তাপমাত্রার তারতম্যের সঙ্গে গাছ দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে অগ্ন্যুৎপাতের কয়েক মাস বা বছর আগে উদ্ভিদের টিস্যুতে এসব পরিবর্তন দেখা যায়। আর তাই আগ্নেয়গিরির আশপাশের বিশাল বন অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস জানাতে তথ্য দিতে পারে।

দাওয়াহ সংবাদ

মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ: ব্যাচ নং- ১৮

'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহীতে গত ১১ই জানুয়ারি, ২০২৫ ইং শুরু হয়ে ১৬ই জানুয়ারি, ২০২৫ ইং পর্যন্ত মোট ৬ দিনব্যাপী ১৮তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন— শায়েখ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, মাহবূবুর রহমান মাদানী, আব্দুর রহিম বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। ব্যাচটিতে অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ২২ জন মক্তব শিক্ষক। উল্লেখ্য যে, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো দেশব্যাপী মক্তব শিক্ষাকে প্রসারিত করতে মক্তব-শিক্ষকের সম্পূর্ণ ফ্রি প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর ফায়েদা হলো—

১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা, ২. মক্তব-শিক্ষার্থীর স্বল্প সময়ে কুরআন শিখানোর কৌশল রপ্ত করা, ৩. শিক্ষার্থীকে সহজে আদব-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতা শেখানো, ৪. দেশে প্রচলিত জাল-বানোয়াট ও অর্থহীন ছড়া বা গল্পের পরিবর্তে সত্য ও শিক্ষামূলক ছড়া বা গল্পের মাধ্যমে শিশুদের আন্দোলিত করা, ৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ছাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা, যাতে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। (আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক প্রণীত নবী ও ছাহাবীদের জীবনীসম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ 'আদর্শ শিক্ষা' বইটি পাঠ্যভুক্ত), ৬. শিক্ষকদের হাতের লেখা চর্চা করানো হয়, যাতে শিক্ষার্থীগণ ভুল লেখা হতে বিরত থাকে এবং ৭. শিক্ষকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দু'আ চর্চা করানো হয়, যাতে সোনামণিরা নিয়মিত দু'আ চর্চায় অভ্যস্ত হয়।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ছিয়াম-রামাযান

প্রশ্ন (১): ছিয়াম এবং ঈদ কত হিজরী থেকে শুরু হয়েছে? কেন দেওয়া হয়েছে এ বিধান?

-নিযামুল হক্ব
চট্টগ্রাম।

উত্তর: ছিয়ামের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য ছিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হতে পার' (আল-বাক্বারা, ১৮৩)। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ছিয়ামের বিধান মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্ববর্তী জাতিদের মধ্যেও ছিল। প্রতিমাসে তিন দিন করে ছিয়াম পালন করা হতো। নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগে দ্বিতীয় হিজরী সালে রামাযান মাসের ছিয়াম শরীআতসম্মত করে পূর্বের পদ্ধতিকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে (তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/৩৬৪)। আর এ বিধান কেন দেওয়া হয়েছে তা আল্লাহ তাআলা নিজেই সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, যাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হতে পার। ঈদ ও রামাযানের ছিয়ামের সাথে সাথে দ্বিতীয় হিজরী সালে শরীআতসম্মত করা হয়েছিল (মিরআতুল মাফাতীহ, ৫/২১)। আর এ বিধান প্রবর্তনের কারণ হলো, আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে এসে দেখেন, মদীনাবাসীরা নির্দিষ্ট দুটি দিনে খেলাধুলা ও আনন্দ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ দুটি দিন কীসের?' সকলেই বলল, জাহেলী যুগে আমরা এ দুইদিন খেলাধুলা করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'মহান আল্লাহ তোমাদের এ দুইদিনের পরিবর্তে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। তা হলো ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন' (আবূ দাঊদ, হা/১১৩৪)।

প্রশ্ন (২): ছোট বাচ্চারা ছিয়াম রাখতে চাইলে করণীয় কী?

-খাদেমুল ইসলাম
খুলনা।

উত্তর: বালেগ না হওয়া পর্যন্ত কারো উপর ছিয়ামের বিধান প্রযোজ্য নয় (আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩)। তবে অভিভাবকদের উচিত শিশুদেরকে বাল্যকাল থেকেই শরীআতের বিধানগুলোর প্রতি অভ্যাসী করে তোলা ও তাদের উৎসাহ দেওয়া। রুবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা আমাদের শিশুদের ছওম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৬)। রামাযানে এক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাদের বাচ্চারা পর্যন্ত ছওম পালন করছে। তোমার সর্বনাশ হোক! অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে প্রহার করেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬০)। এজন্য বাচ্চাদের ছোট থেকেই ছিয়ামের প্রতি অভ্যাসী করা তোলা উচিত।

প্রশ্ন (৩): শুক্রবারে ছিয়াম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, আবার আরাফার দিনে ছিয়াম রাখার ফযীলত অনেক। আমার প্রশ্ন হলো আরাফার দিন যদি শুক্রবারে হয়, তাহলে কী করতে হবে?

-সাব্বির আহমেদ
সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তর: সেক্ষেত্রে সেদিন ছিয়াম রাখতে হবে। এককভাবে জুমআর দিন ও শনিবার ছিয়াম রাখা নিষিদ্ধ হলেও তা আরাফার দিন বা আশুরার দিন বা নফল কোন ছিয়ামের সাথে মিলে গেলে সেদিন ছিয়াম রাখা যাবে। রাসূল ﷺ বলেন, 'দিনগুলোর মধ্যে শুধু জুমআর দিনকে ছিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না। তবে যদি তোমাদের কেউ ছিয়াম পালনে অভ্যাসী হয় আর এ ছিয়ামের (ধারাবাহিকতার) মধ্যে জুমআর দিন এসে যায়, তাহলে ভিন্ন কথা' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৪)। আরাফার ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন, 'আরাফার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে আল্লাহর কাছে আশা করি যে, তিনি বিগত এক বছর ও আগামী এক বছরের পাপ ক্ষমা করে দিবেন' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৩৬)।

প্রশ্ন (৪): ছিয়াম ভঙ্গকারী জিনিসগুলো কী কী?

-খলিল আহমাদ
বরিশাল।

উত্তর: ছিয়াম ভঙ্গকারী জিনিসগুলো হলো- ১. সহবাস করা, ২. খাদ্য গ্রহণ করা, ৩. পানীয় গ্রহণ করা, ৪. উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হওয়া, ৫. খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত এমন কিছু গ্রহণ করা। যেমন- সেলাইন ইত্যাদি, ৬. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা এবং ৭. হায়েয বা নেফাসের রক্ত প্রবাহিত হওয়া (সূরা বাকারা, ২/১৮৭; লিকাউল বাবিল মাফতুহ লি উছায়মীন, ৫/২২২)।

প্রশ্ন (৫): পুরো বিশ্ব একদিনে ছিয়াম রাখবে নাকি নিজ নিজ চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখবে- এ ব্যাপারে যেহেতু মতানৈক্য আছে। তাই আমি যদি দুয়েকদিন আগে থেকে ছিয়াম শুরু করি, তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষ নিজ নিজ চাঁদ দেখেই ছিয়াম শুরু করবে। একদিনে ছিয়াম শুরু বা ঈদ পালন করবে না। এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কেননা রাসূল ﷺ বলেন, ‘তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো, আবার চাঁদ দেখে তা ভঙ্গ করো আর যদি আকাশ মেঘলা থাকে, তবে সময় হিসাব করে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৯০০)। সন্দেহ নিরসণে দুয়েকদিন আগে থেকে ছিয়াম রাখা যাবে না। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা এক-দুইদিন পূর্বে ছিয়াম পালনের মাধ্যমে রামাযানকে অগ্রসর করো না। তবে কেউ যদি এ ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে সে তা পালন করতে পারে’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৮১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮২)। আম্মার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে ছওম পালন করল সে আবূল কাসিম ﷺ-এর নাফরমানী করল (ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৬)। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘মাস উনত্রিশ রাত বিশিষ্ট হয়। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে ছিয়াম শুরু করবে না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৮০৮)।

প্রশ্ন (৬): সুস্থ শরীরে একটি ছিয়াম ভাঙলে কয়টি ছিয়াম রাখতে হবে? ছিয়াম অবস্থায় সহবাস হয়ে গেলে করণীয় কী?

-নাজমুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর: কোনো শারঈ ওযর ছাড়া সুস্থ শরীরে ইচ্ছাকৃতভাবে ছিয়াম ভঙ্গ করা অনেক বড় পাপ। অতি সত্ত্বর ঐ ব্যক্তিকে তওবা করতে হবে এবং ঐ দিনের পরিবর্তে একদিন কাযা আদায় করতে হবে (ফাতওয়া নুরুন আলাদ দারব, ১৬/২০৪)। আর একদিন ছিয়াম ভঙ্গের পরিবর্তে এক যুগ ছিয়াম রাখলেও তার পরিপূরক হবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ (ইবনে মাজাহ, হা/১৬৭২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১০০৮০)। তবে কেউ যদি ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে; তাহলে দাস মুক্ত করবে, এটা সম্ভব না হলে একাধারে ২ মাস ছিয়াম রাখবে, তাতেও সক্ষম না হলে ৬০ জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৬)।

প্রশ্ন (৭): আমি শুক্রবারের দিন ফজরের সময় স্বপ্নদোষের কারণে ফরয গোসল করেছি। এখন জুমআর ছালাতের জন্য কি আবার গোসল করতে হবে? রাতে এমন হলে ঐদিন ছিয়ামের বিধান কী?

-মেহেদী
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর: জুমআর ছালাতের জন্য গোসল করা ফরয নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। সামুরা ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুমআর দিন শুধু ওযূ করল সেটাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি গোসল করল, গোসল করা উত্তম’ (তিরমিযী, হা/৪৯৭)। তাই ব্যক্তি ঐ গোসলেই জুমআর ছালাত আদায় করতে পারে। আর রাতে এমন হলে তার ছিয়ামের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। নিঃসন্দেহে ছিয়ামের কোনো সমস্যা হবে না যদিও ফজরের সময় প্রবেশের পরে গোসল করা হয়। আয়েশা ও উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন যে, নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনজনিত জুনূবী অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ফজরের সময় হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন এবং ছওম পালন করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/ ১৯২৫)। তবে গোসলে বিলম্বের কারণে ফজরের ছালাত যেন ছুটে না যায়।

প্রশ্ন (৮): রামাযান মাসের ছিয়ামের পর কোন কোন ছিয়াম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

-মমতাজ উদ্দিন
সাধনপুর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর: রামাযানের ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোনো ছিয়াম আমাদের উপর ফরজ নয় (আল-বাকারা, ২/১৮৩)। রামাযানের ছিয়ামের পর গুরুত্বপূর্ণ ছিয়াম হলো মুহাররম মাসের ছিয়াম। রাসূল ﷺ বলেন, ‘রামাযান মাসের ছিয়ামের পর শ্রেষ্ঠ ছিয়াম হলো মুহাররম মাসের ছিয়াম আর ফরয ছালাতের পর শ্রেষ্ঠ হলো তাহাজ্জুদের ছালাত’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩)। এছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নফল ছিয়াম রয়েছে। যেমন- রামাযান পরবর্তী শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম, শা‘বান মাসের ছিয়াম, আরাফার দিনে ছিয়াম, মাসে তিনটি ছিয়াম, সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখা। এছাড়াও রাসূল ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ছিয়াম হলো দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর ছিয়াম। তিনি একদিন ছিয়াম পালন করতেন আর একদিন বিরত থাকতেন’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪২০)।

প্রশ্ন (৯): রামাযানের এক দিন আগেও আমরা ফজরের ছালাত পড়েছি ৫:২০-৫:২৫ মিনিটে। তখন কিন্তু অন্ধকার। রামাযানে ফজর পড়ি ৪:৩০ মিনিটে বা তার আগে। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

-মোহিদুল ইসলাম
নবীনগর, বি-বাড়িয়া।

উত্তর: ফজর ছালাতের জামাআত সবসময় আওয়াল ওয়াক্তে করতে হবে; রামাযানে হোক বা রামাযানের বাহিরে অন্য কোনো মাসে। রাসূল ﷺ-কে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' (আবূ দাঊদ, হা/৪২৬)। রামাযানে রাসূল ﷺ-এর সাহারী ও ছালাতে দাঁড়ানোর সময়ের ব্যাপারে যায়েদ ইবনু ছাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সাহারী খাই এরপর তিনি ছালাতের জন্য দাঁড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আযান ও সাহারীর মাঝে কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত (পাঠ করা) পরিমাণ (ছহীহ বুখারী, হা/১৯২১)। এজন্য রামাযানে সাহারীর পর ৫০ আয়াত সমপরিমাণ বা ১৫/২০ মিনিট পর ছালাতে দাঁড়াতে হবে। একইভাবে রামাযানের বাহিরে আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করতে হবে। অন্য মাসে ভোর আলোকিত হয়ে যাওয়ার পর ছালাত আদায় করা উচিত নয়।

প্রশ্ন (১০): কেউ যদি পুরো রামাযান মাস সফরে থাকে, তাহলে সে কীভাবে ছিয়াম রাখবে?

-জাকারিয়া
কুমিল্লা।

উত্তর: মুসাফির বা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ইসলাম রামাযান মাসে ছিয়াম রাখার বিষয়টি শিথিল করেছে। তথা তারা অন্য মাসে ছিয়ামের কাযা আদায় করে নিবে। মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির রামাযান মাসে ছিয়াম না রাখা উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় অথবা সফরে থাকে, তাহলে সে অন্য দিনগুলোতে তার কাযা আদায় করবে' (আল-বাকারা, ২/১৮৫)। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ছাড়। আর তার ছাড় গ্রহণ করা উত্তম। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ পাপের কাজ করা যেমন অপছন্দ করেন, তেমন তার ছাড় গ্রহণ করা তিনি পছন্দ করেন' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৮৬৬)। তবে কেউ চাইলে ছিয়াম রাখতে পারে। আবূ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমে রামাযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। গরমের তাপে আমাদের কেউ কেউ তার হাত মাথার উপর রেখেছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ব্যতীত আমাদের মাঝে কেউ ছিয়াম পালনকারী ছিল না (ছহীহ মুসলিম, হা/১১২২)।

প্রশ্ন (১১): রামাযান মাসে কুরআন খতম দেওয়ার ফযীলত কী? ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি রামাযান মাসে খতম দিলে ৭০ গুণ বেশি ছওয়াব হয়, এর সত্যতা কী?

-তাসলিমা
তকবাজখানী, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

উত্তর: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রামাযান মাসে প্রত্যেক সৎকাজের ছওয়াব বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়, যা বিভিন্ন হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয়, যেমন উমরা সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'রামাযান মাসে একটি উমরা আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায় করার সমান' অথবা বলেছেন, 'আমার সাথে একটি হজ্জ আদায় করার সমান' (বুখারী, হা/ ১৮৬৩, মুসলিম, হা/১২৫৬)। লায়লাতুল কদরে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ 'লায়লাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ' (আল-ক্বদর, ৯৭/৩)। এই ফযীলত আছে বলেই রাসূল ﷺ এ মাসে দান করার গতি বৃদ্ধি করে দিতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩০৮)। বিশেষভাবে কুরআন মাজীদের ফযীলত এ হাদীছ থেকেও বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর সাথে রামাযানে কুরআনের দাওর করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩০৮)। সুতরাং রামাযান মাসে কুরআন মাজীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া একজন মুসলিমের কর্তব্য। তবে আমলের ছওয়াব সত্তর গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় মর্মে যে হাদীছটা আছে তা যঈফ, গ্রহণযোগ্য নয় (শুআবুল ঈমান, হা/৩৬০৭)।

প্রশ্ন (১২): ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া যাবে কি?

-কাওছার মাহমুদ
মিরপুর ৬, ঢাকা -১২১৬।

উত্তর: ছিয়ামরত অবস্থায় সাধারণত চুম্বন না করাই উত্তম। কেননা এতে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। রাসূল ﷺ এক যুবককে নিষেধ করেছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একজন লোক নবী ﷺ-কে ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। আরেকজন এসে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। যাকে তিনি অনুমতি দিলেন সে ছিল বৃদ্ধ আর যাকে নিষেধ করলেন সে ছিল যুবক (আবূ দাঊদ,

হা/২৩৮৭)। আর রাসূল ﷺ নিজে এমন করতেন। কারণ তিনি মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি কামভাবকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম ছিলেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিয়াম অবস্থায় চুম্বন করতেন, মেলামেশা করতেন। তিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তার কামভাবকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম ছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১১০৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫৬৫৩)।

প্রশ্ন (১৩): আমার পিরিয়ড ৩ দিন হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু ৯ম/১০ম দিনে আবার হয় ১/২ দিন থাকে, এটা কি অসুস্থতা নাকি পিরিয়ড, এমতাবস্থায় ছিয়ামের বিধান কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর: এটা ইসতিহাযা হিসেবেই গণ্য হবে। মাসিকের নির্ধারিত সময়ের পরেও রক্তপাত হলে সেটা ইসতিহাযা বা রক্তপ্রদর রোগ। সেক্ষেত্রে ছিয়াম রাখবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতু আবী হুবায়শ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার এত বেশি রক্তস্রাব হয় যে, আমি পবিত্র হতে পারি না; এমতাবস্থায় আমি কি ছালাত ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না, এ তো রগ থেকে নির্গত রক্ত; মাসিক নয়। তাই যখন তোমার মাসিক আসবে, তখন ছালাত ছেড়ে দিও আর যখন তা বন্ধ হবে, তখন রক্ত ধুয়ে ফেলে ছালাত আদায় করবে'। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলেছেন, (নবী ﷺ আরও বললেন) 'তারপর এভাবে পরবর্তী মাসিকের দিন না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক ছালাতের জন্য কেবল ওযূ করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২২৮)। এক্ষেত্রে কয়দিন হায়েয বিবেচিত হবে তার অস্পষ্টতা দূর করার মাধ্যম হলো, হায়েযের প্রথম দিকের অবস্থা লক্ষ্য করা।

প্রশ্ন (১৪): রামাযানে কি বিকট আওয়াজ হবে? এই ১৫ রামাযানেই কি মহাকাশে বিকট শব্দ হবে?

-খোকন

চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: এমর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। এ প্রসঙ্গে 'আল-মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থের ৮৫৩ নং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যা হায়ছামী 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' গন্থে ১২৩৭৩ নং হাদীছে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীছে আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু যাহহাক নামে একজন রাবী আছেন, তিনি পরিত্যাজ্য রাবী। সুতরাং হাদীছটি যঈফ।

প্রশ্ন (১৫): একই সফরে একাধিক উমরা পালন করার বিধান কী? যেমন- নিজের পক্ষ থেকে, মায়ের পক্ষ থেকে। রামাযানে উমরা করার আলাদা কোনো ফযীলত আছে কি?

-আনোয়ার হোসেন

কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর: কিছু মানুষ হজ্জের পর অধিক সংখ্যক উমরা পালনের উদ্দেশ্যে 'তানঈম' এ গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসেন। শরীআতে এর কোনোই প্রমাণ নেই। তাই এক সফরে একাধিক উমরা করা যাবে না। যেমন- নিজের পক্ষ থেকে, বাবার পক্ষ থেকে, মায়ের পক্ষ থেকে। কেননা রাসূল ﷺ এবং ছাহাবীগণ থেকে এক সফরে একাধিক উমরার কোনো বর্ণণা পাওয়া যায় না। এজন্য মক্কায় এসে হজ্জ বা উমরার পরে আবার তানঈমে গিয়ে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা যাবে না। আর যেকোনো সময় উমরা করা যায় তবে রামাযানে উমরার ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'রামাযান মাসে উমরা পালন হজ্জের সমতুল্য' (ছহীহ বুখারী, হা/১৭৮২; ইবনে মাজাহ, হা/২৯৯২)।

প্রশ্ন (১৬): রামাযান মাসের শুক্রবারে মারা যাওয়ার আলাদা কোনো ফযীলত আছে কি?

-মো. মাইনুল ইসলাম

৭১, পুরানা পল্টন।

উত্তর: রামাযান মাসের শুক্রবারে মারা যাওয়ার আলাদা কোনো ফযীলত ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায় না। একটি বর্ণনায় রামাযানে মারা গেলে কবরের শাস্তি মাফ করার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ণনাটি নিতান্তই দুর্বল (তাফসীরে ইবনে রজব, ২/৩৭৫)। তবে জুমআর দিনে মৃত্যুর ফযীলত রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জুমআর দিনে অথবা জুমআর রাতে কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে কবরের ফিতনা হতে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন' (তিরমিযী, হা/১০৭৪)।

প্রশ্ন (১৭): অনেকে মনে করে জোড় রাতে কদর হয় না, জোড় রাতে কি কদর হতে পারে না?

-সাদ মুহাম্মাদ

বড় মির্জাপুর, খুলনা।

উত্তর: কদরের রাতকে শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোয় খুজঁতে হবে। কেননা বিজোড় রাতে কদর হওয়ার অধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের

বেজোড় রাতে লায়লাতুল কদরের অনুসন্ধান করো' (ছহীহ বুখারী, হা/২০১৭)। তবে জোড় রাতেও হতে পারে। কোনো বর্ণণায় রাসূল ﷺ শুধু শেষ দশকের কথা উল্লেখ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৫)। আরেক বর্ণণায় রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমরা রামাযানের শেষ রাতে লায়লাতুল কদর তালাশ করো' (জামিউছ ছগীর, হা/১২৩৮)। আর রামাযান ২৯ দিনে হতে পারে আবার ৩০ দিনেও হতে পারে। সুতরাং জোড় রাতেও কদর হতে পারে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত আছে, তোমরা ২৪ তম রাতে তালাশ করো (ছহীহ বুখারী, হা/২০২২)।

প্রশ্ন (১৮): আমাদের এলাকায় রামাযান মাসে মসজিদের ইমাম মুয়াযযিন মিলাদ করে, রামাযানে সাহরীর সময় গযল বলে, ডাকাডাকি করে, মসজিদে বিভিন্ন পীরের মুরিদের যিকির হয়, আলোচনা হয়। রামাযান কেন্দ্রিক এগুলো করার বিধান কী?

-মো. সবুজ মিয়া
ঢাকা।

উত্তর: রামাযানে ও রামাযানের বাহিরে মিলাদ করা, সাহারীর সময় গযল বলা, ডাকাডাকি করা, মসজিদে বিভিন্ন পীরের মুরিদের যিকির করা এগুলো শরীআতে স্পষ্ট বিদআত। ইবাদতের নামে এ শরীআতবিরোধী কাজগুলো করা হয়। যার প্রমাণে কোনো জাল-যঈফ হাদীছও নেই। এমনকি ফিকাহ শাস্ত্রের কোনো বইয়েও নেই। রাসূল ﷺ, ছাহাবী বা তাবেঈ থেকে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। নবী ﷺ বলেছেন, 'কেউ আমাদের এ শরীআতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭)। এছাড়াও এসময় মাইকের আওয়াজ ইবাদতকারীদের ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাছাড়া অসুস্থ পুরুষ-নারী, শিশু ও অমুসলিমদের ঘুমেরও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন (১৯): শাওয়ালের ছিয়াম কি একটানা ৬টি থাকতে হবে, নাকি মাঝে মাঝে থাকলে হবে? আমি যদি প্রতি সোমবার, বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখি; তাহলে কি শাওয়ালের ছিয়াম আদায় হবে নাকি আলাদাভাবে থাকতে হবে?

-হাসান আলী
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর: শাওয়ালের ছিয়াম লাগাতার বা ধারাবাহিকভাবে রাখাই উত্তম। কেননা হাদীছে এসেছে, আবূ আয়্যূব আল-আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করে, অতঃপর তার সাথে শাওয়াল মাসের ছয়দিন ছিয়াম পালন করা সারা বছর ছওম পালন করার মতো' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৮)। আর কোনো ব্যক্তির প্রতি সোমবার, বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখার অভ্যাস থাকলে এবং শাওয়ালের ছিয়াম ঐদিন পড়ে গেলে একসাথে দুই ছিয়ামের ফযীলত পেয়ে যাবে, ইনশা-আল্লাহ।

প্রশ্ন (২০): যদি কেউ রামাযান মাসে পিল/ওষুধ খেয়ে হায়েয বন্ধ রেখে ছিয়াম পালন করে, তাহলে কি কোনো গুনাহ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: রামাযান মাসে ওষুধ খেয়ে হায়েয বন্ধ রেখে ছিয়াম পালন করতে পারে, যদি তা স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর না হয়। রাসূল ﷺ হায়েযের ব্যাপারে বলেন, 'এটা তো আল্লাহ তাআলা আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন' (ছহীহ বুখারী, হা/২৯৪)। তবে আল্লাহর বিধানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চলমান রাখা উচিত এবং এ ছিয়ামগুলো পরবর্তীতে আদায় করে নিবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার উপর রামাযানের যে কাযা হয়ে যেত তা পরবর্তী শা'বান ব্যতীত আমি আদায় করতে পারতাম না (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫০)।

প্রশ্ন (২১): গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী নারী ছিয়াম রাখতে পারবে কি? না পারলে কী করবে? বিস্তারিত জানতে চায়।

-সোহেল রানা
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর: নিজের ও বাচ্চার ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে ছিয়াম পালন করবে। আর যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তারা ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং অন্য সময় করে নিবে। আল্লাহ অন্য সময় করার জন্য আদেশ করেছেন (আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)। তবে এরাও ফক্বীর-মিসকীনকে ছিয়ামের পরিবর্তে খাদ্য দান করতে পারে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী, 'সামর্থ্যবান তারা মিসকীনদের ফিদিয়া প্রদান করবে'। তিনি বলেন, এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থাস্বরূপ। যদি তারা ছিয়াম রাখতে সামর্থ্য হয়, তবে ছিয়াম রাখবে; অন্যথায় প্রত্যহ একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মা যদি সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কাবোধ করে, তবে তাদের জন্যও এ নির্দেশ বহাল রয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়, তবে

তারা ছিয়াম না রেখে (মিসকীনকে) খাদ্য খাওয়াতে পারে (আবূ দাঊদ, হা/২৩১৮)।

প্রশ্ন (২২): যে সব দেশে ১৬/১৭ ঘণ্টা সূর্য থাকে, সেসব দেশে কীভাবে ছিয়াম পালন করতে হবে?

-আদিল
দিনাজপুর।

উত্তর: সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া বা পান করা ও স্ত্রী সহবাসসহ যাবতীয় অশ্লীল কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখাই হলো ছিয়াম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা পানাহার করো; যতক্ষণ কালো সুতা (রাতের কালো রেখা) হতে ঊষার সাদা সুতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না হয়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত ছিয়াম পূর্ণ কর (আল-বাকারা, ২/১৮৭)। সুতরাং ১৬/১৭ ঘণ্টা সূর্য থাকলেও সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়াম রাখতে হবে।

সাহারী-ইফতার

প্রশ্ন (২৩): আমাদের এলাকার মসজিদে ইফতার হয়। সেখানে সম্মিলিত মুনাজাত হয়। সে সময় আমি তাদের দু'আয় শরিক না হয়ে একাকী হাত তুলে দু'আ করতে পারব কি?

-ওবাইদুল ইসলাম
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তর: না, হাত না উঠানো দু'আ করতে হবে। 'তিন ব্যক্তির দু'আ ফেরত দেওয়া হয় না। পিতা-মাতার দু'আ, ছিয়াম পালনকারীর দু'আ ও মুসাফিরের দু'আ' (জামেউছ ছগীর, হা/৫৩৪৩)। অত্র হাদীছে ছিয়াম পালনকারীর দু'আ কবুল হয় বলে বর্ণিত হয়েছে। এখানে হাত দুলে দু'আ করার কথা উল্লেখ হয়নি। সুতরাং হাত উঠানো ব্যতীত ছিয়ামরত অবস্থায় যেকোনো সময় দু'আ করা যায়। শুধু ইফতারের সময়টি নির্ধারিত নয়। আর রামাযান পুরোটাই রহমতের মাস, তাই মানুষ রামাযানের দিনে-রাতে যেকোনো সময় দু'আ করবে। কোনো সময়কে খাছ করা যাবে না। আর ইফতারের পূর্বে সম্মিলিত মুনাজাতের কোনো প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন (২৪): মাইকে 'সাহারী খাওয়া নিষেধ' এরকম বলার সময় পানি খাওয়াতে কি ছিয়াম নষ্ট হয়ে যায়?

-এস এম মহিউদ্দীন
চাপাপুর, কুমিল্লা।

উত্তর: সাহারীর সময় মানুষকে জাগানোর জন্য মাইকে ডাকাডাকি করা, গযল গাওয়া, সময় বলে দেওয়া, সাহারী খাওয়া নিষেধ বলে ঘোষণা দেওয়া বা সাহারীর সময় শেষ বলে ঘোষণা করা ইত্যাদি নতুন আবিষ্কৃত, যা শরীআতে কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং এগুলো বিদআত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার এ দ্বীনে এমন কিছু নতুন চালু করল যা তাতে নেই, তা পরিত্যাজ্য' (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৫০)। বরং এভাবে নিষেধ করা ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কেননা আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি ফজরের আযান শুনতে পায় আর এ সময় তার হাতে খাদ্য বা পানির পাত্র থাকে, তাহলে সে যেন প্রয়োজন পূরণ না করা পর্যন্ত পাত্র না রাখে' (আবূ দাঊদ, হা/২৩৫০)। আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে রওয়ানা দিলাম এবং তিনি ছিয়ামরত ছিলেন। সূর্য অস্ত যেতেই তিনি বললেন, 'তুমি সওয়ারী হতে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলে আনো'। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর একটু সন্ধ্যা হতে দিন। তিনি বললেন, 'তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে আনো'। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখনো তো আপনার সামনে দিন রয়েছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে আনো'। অতঃপর তিনি সওয়ারী হতে নামলেন এবং ছাতু গুলে আনলেন। এরপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙুল দ্বারা পূর্বদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'যখন তোমরা দেখবে যে, রাত এদিক হতে আসছে, তখনই ছওম পালনকারী ইফতার করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৬)। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, এসময় খেলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন (২৫): সাহারীর আযান সাহারী রান্নার জন্য দিতে হবে, নাকি সাহারী খাওয়ার জন্য দিতে হবে? এবং সেটা ফজরের আযানের কতক্ষণ আগে দিতে হবে?

-মইনুল ইসলাম
ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তর: সাহারী খাওয়ার জন্য হোক বা রান্না করার জন্য হোক অথবা তাহাজ্জুদে ডাকার জন্য হোক সবকিছুর সমন্বয়ে এ আযান দেওয়া হয়। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বেলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহারী থেকে বিরত না রাখে। কেননা মুছল্লী ব্যক্তি বাড়ি ফিরে যায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘ফজর দুই প্রকার- ১. প্রথম প্রকার হলো যাতে আহার করা হারাম নয় আর ছালাত আদায় হালাল নয়। ২. দ্বিতীয় প্রকার হলো যাতে খাবার খাওয়া হালাল নয় আর ছালাত আদায় করা হালাল’ (ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/১৯২৭)। হাদীছের সারমর্মে বুঝা যায়, এটা সাহারী ও তাহাজ্জুদের সময়ের সমন্বয়, যার দ্বারা একটি সময়কে বুঝানো হয়েছে যাতে তৈরিকৃত খাবার খাওয়া বা খাবার তৈরি করা তাদের জন্য সহজ হয়।

প্রশ্ন (২৬): রামাযান মাসে রাত্রিবেলা স্বপ্নদোষ হয়েছে অর্থাৎ গোসল ফরয হয়েছে, সে জাগ্রত হয়ে দেখে যে সাহারী খাওয়ার সময় নেই, গোসল করলে সাহারী খাওয়ার সময় পাবে না। এখন কি সে সাহারী খাবে না গোসল করবে?

-রহমত আলী
আসাম, ভারত।

উত্তর: এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি আগে সাহারী খাবে। সাহারী খাওয়ার পর গোসল করে ছালাত আদায় করবে। কেননা সাহারী খাওয়ার জন্য পবিত্রতা হওয়া শর্ত নয়। আয়েশা ও উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা সূত্রে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযান মাসে অপবিত্র অবস্থায় ভোর করতেন। রামাযানের রাতে স্বপ্নদোষের কারণে নয়, বরং সহবাসজনিত কারণে। তারপর তিনি ছিয়াম পালন করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১১০৯; আবূ দাঊদ, হা/২৩৮৮)। আরেক বর্ণনায় আছে, নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসজনিত জুনূবী অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ফজর হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন এবং ছিয়াম পালন করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯২৬)।

প্রশ্ন (২৭): সাহারী খাওয়ার পর, ফজরের আযানের আগেই ফজরের ছালাত পড়ে নেওয়া যাবে কি?

-মোহম্মদ ইউসুফ
নর্দ্দা গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

উত্তর: প্রত্যেক ছালাতের সময় শরীআতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নির্ধারিত সময়ে ছালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য’ (আন-নিসা, ৪/১০৩)। সুতরাং কোনো ছালাত যদি তার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পড়ে নেওয়া হয়, তাহলে ঐ ছলাত কবুল হবে না, সময় হওয়ার পর পুনরায় ঐ ছালাত আদায় করতে হবে। আর যদি সময় প্রবেশ করে গেছে এবং কোনো কারণবশত আযান হয়নি, তাহলে প্রয়োজনে ছালাত পড়া যায়। অপ্রয়োজনে জামাআত ছেড়ে ছালাত পড়া যাবে না। বরং মসজিদে যখন জামাআত হবে তখন জামাআতে শামিল হয়ে পড়তে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, وارکعوا مع الراکعین ‘তোমরা রুকূকারীদের সাথে রুকূ করো’ (আল-বাক্বারা, ২/৪৩)। অর্থাৎ জামাআতে ছালাত আদায় করো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয় যে, যারা ছালাতের জামাআতে শামিল হয়নি তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৭, মসলিল, হা/৬৫১)।

প্রশ্ন (২৮): আযান শুনেই ইফতার করা আবশ্যক নাকি চার্ট বা সময় দেখেও ইফতার করা যাবে?

-ফজলে আবেদ
কাজীপাড়া, বোদা, পঞ্চগড়।

উত্তর: সূর্যাস্ত হয়ে গেলে ইফতার করতে হবে। উমার ইবনু খাত্তাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যখন রাত এ দিক হতে ঘনিয়ে আসে, দিন এ দিক হতে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন ছায়েম ইফতার করবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১০০)। এবং অন্য হাদীছের মধ্যে রাসূল ﷺ ইফতারে বিলম্ব করা থেকে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেন, ‘লোকেরা যতদিন শীঘ্র ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮)। আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা দিলাম এবং তিনি ছওমরত ছিলেন। সূর্য অস্ত যেতেই তিনি বললেন, ‘তুমি সওয়ারী হতে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলে আনো’। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর একটু সন্ধ্যা হতে দিন। তিনি বললেন, ‘তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে আনো’। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখনো তো আপনার সামনে দিন রয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ‘তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে আনো’। অতঃপর তিনি সওয়ারী হতে নামলেন এবং ছাতু গুলে আনলেন। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আঙুল দ্বারা পূর্বদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ‘যখন তোমরা দেখবে যে, রাত এদিক হতে আসছে, তখনই ছওম পালনকারী ইফতার করবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৬)। এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, সূর্য ডুবার সাথে সাথে ইফতার করতে হবে।

প্রশ্ন (২৯): ছিয়াম না রাখার নিয়তে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে সাহারীর সময় একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে কি?

-খাইরুল আমিন
সংযুক্ত আরব আমিরাত।

উত্তর: যারা ছিয়াম রাখবে তাদের জন্য সাহারী করা সুন্নাত। রাসূল ﷺ বলেন, ‘তোমরা সাহারী খাও। কারণ সাহারীতে বরকত রয়েছে’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৯২৩)। তবে কোনো কারণবশত তথা পিরিয়ড বা অন্য কোনো কারণে ছিয়াম রাখার নিয়ত না থাকলেও পরিবারের সাথে সাহারী খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (৩০): আমাদের মসজিদে পুরো রামাযান মাস ইফতারের আয়োজন করা হয়। যেকোনো লোক ইফতার দিতে পারে এবং যেদিন কেউ দেয় না সেদিন মসজিদ কমিটি থেকে দেওয়া হয় এবং মসজিদের মাইকে ইফতারের দাওয়াত দেওয়া হয়। অনেক ছোট বাচ্চারা আসে এবং অনেকে ছিয়াম থাকে না তারাও আসে। আমার প্রশ্ন, এরকম আয়োজন কি করা যাবে?

-আব্দুল্লাহ
শাহমখদুম, রাজশাহী।

উত্তর: জরুরী প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিকতা করে ইফতারের আয়োজন করতে পারে, তবে না করাই উত্তম। কেননা তাতে বাড়তি রান্নাবান্নার কার্যক্রম, ছিয়ামরত অবস্থায় হৈচৈ, অনর্থক কথাবার্তা, যিকির-আযকার থেকে দূরে থাকা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকদেখানো আমল, সম্মিলিত মুনাজাতের মত বিদআতসহ আরো কিছু অহেতুক কাজ হয়ে থাকে। তবে একক দাওয়াতে ইফতারের ব্যবস্থা করতে পারে। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘কোনো ছিয়াম পালনকারীকে যে লোক ইফতার করায় সে লোকের জন্যও ছিয়াম পালনকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। কিন্তু এর ফলে ছিয়াম পালনকারীর ছওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না’ (তিরমিযী, হা/৮০৭)।

তারাবীহ

প্রশ্ন (৩১): তারাবীহর ছালাত কখন কীভাবে কত রাকআত পড়তে হবে? ২০ রাকআত পড়লে কি গুনাহ হবে?

-আব্দুল্লাহ মামুন
রাজশাহী।

উত্তর: রামাযান মাসে জামাআতের সাথে এশার ছালাত আদায় করে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের ছালাত পড়া যায়। রামাযান মাসে জামাআতের সাথে তারাবীহ পড়তে পারে। কেউ চাইলে একাকীও পরতে পারে। তারাবীহর ছালাত আট রাকআতই পড়তে হবে, যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে জিজ্ঞেস করেন, রামাযান মাসে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ রামাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতে) এগারো রাকআতের অধিক ছালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন। তুমি সেই ছালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকআত (বিতর) ছালাত আদায় করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, (একদা) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতরের পূর্বে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি ইরশাদ করলেন, ‘আমার চোখ দুটি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না’ (ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৭)। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু উবাই বিন কা‘ব ও তামীম দারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে ১১ রাকআত জামাআত সহকারে ছালাত আদায় করার হুকুম দিয়েছিলেন (মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৩৭৯)। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর যামানায় ২০ রাকআত তারাবীহ পড়া হতো বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা নিতান্তই যঈফ এবং ২০ রাকআত তারাবীহ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে মারফূ‘সূত্রে যে বর্ণনা এসেছে তা মাওযূ বা জাল (আলবানী, হাশিয়া মিশকাত, হা/১৩০২, ১/৪০৮; ইরওয়া, ২/১৯৩, হা/৪৪৬ ও ৪৪৫-এর ব্যাখ্যা দ্র.)। এতদ্ব্যতীত ২০ রাকআত তারাবীহ সম্পর্কে আরো যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে, তার সবগুলোই জাল কিংবা যঈফ (মিরআত, ২/২২৯, ২৩৩, হা/১৩০৮ ও ১৩১২)। সুতরাং আট রাকআতই তারাবীহ পড়তে হবে; ২০ রাকআত নয়। তারপরও কেউ বিশ রাকআত পড়লে তা শরীআতবিরোধী বিবেচিত হবে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত স্বনামধন্য হানাফী বিদ্বান আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহিমাহুল্লা-হু বলেন, বিশ রাকআত সম্পর্কে যত হাদীছ এসেছে, তার সবগুলোয় যঈফ (আরফুশ শাযী, তারাবীহ অধ্যায়, পৃ. ৩০৯)। আল্লামা যায়লাঈ হানাফী বলেন, বিশ রাকআতের হাদীছ যঈফ এবং আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী (নাছবুর রা’য়াহ, ২/১৫৩ পৃ.)। এছাড়া হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ হেদায়ার ভাষ্যকার ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, ২০ রাকআতের হাদীছ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী (ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২০৫ পৃঃ)।

প্রশ্ন (৩২): তারাবীহর ছালাতের সময় কিছু হাফেয এত দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করে যে তা আমাদের মতো

জনসাধারণের স্পষ্টভাবে শুনতে বা বুঝতে অসুবিধা হয়। এমতাবস্থায় হাফেযদের কিছু বলতেও বিব্রতবোধ করি। অথচ কুরআন আস্তে ধীরে বুঝেশুনে তিলাওয়াতের নির্দেশ আছে, আমি যতোদূর জানি। এক্ষেত্রে করণীয় কী?

-মো. সৈকত হোসেন
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: দ্রুত কিরাআত পাঠ করা করা কাম্য নয়; ধীরস্থিরভাবে তারতীল সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কুরআন পাঠ করো ধীরে ধীরে সুন্দর আওয়াজে' (আল-মুযযাম্মিল, ৭৩/৪)। এছাড়াও ছালাতের সকল কর্ম ধীরস্থিরভাবে আদায় করা জরুরী। রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন ব্যক্তিকে মসজিদে তাড়াহুড়া করে ছালাত আদায় করতে দেখে বলেছিলেন, 'তুমি আবার ছালাত আদায় করো। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি' (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭)। এক্ষণে বিষয়টি নিজে বা অন্য কারো মাধ্যমে ইমামকে অবগত করাতে হবে এবং ইমামকে ধীরস্থিরভাবে তারতীল সহকারে ছালাতে কিরাআত করতে হবে। এরপরেও সমাধান না হলে পাশের কোনো মসজিদে যেখানে ধীরস্থিরভাবে কিরাআত হয়, সেখানে ছালাত আদায় করতে পারে। আর ইমামকে মুছল্লীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছালাত আদায় করাতে হবে। মুছল্লীদের যাতে কোনো ধরনের কষ্ট না হয় সে জন্য ছালাত দীর্ঘ করবে না, কিরাআত, রুকূ ও সিজদা স্বাভাবিক রাখবে, নির্ধারিত সময় অতিক্রম করবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মানুষের ইমামতি করবে, তখন ছালাত হালকা করে আদায় করবে। কেননা তাদের মধ্যে ছোট, বড়, দুর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে। আর যখন একাকী ছালাত আদায় করবে, তখন যেভাবে ইচ্ছা আদায় করবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৬৭; তিরমিযী, হা/২৩৬)।

প্রশ্ন (৩৩): ক্লান্তি, সফর বা কোনো ব্যস্ততার কারণে যদি কোনো দিনের তারাবীহ পড়া না হয়, তাহলে কি গুনাহ হবে এবং ঐ দিনের তারাবীহ এর ছালাত কি পরে কাযা পড়তে হবে?

-জসীম উদ্দীন
স্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর: রামাযানে নেকীর একটি বড় মাধ্যম হলো ছালাতুল লায়ল বা তারাবীহ। কারণবশত তারাবীহ না পড়লে গুনাহগার হবে না। রাসূল ﷺ দুই বা তিনদিন তারাবীহ পড়ার পর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাতে লোকজন সমবেত হলেন, কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ বের হলেন না। তিনি তারাবীহ ফরয হওয়ার আশঙ্কায় সেদিন বের হননি (ছহীহ বুখারী, হা/১১২৯)। তবে বিনা কারণে তারাবীহ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ছওয়াব লাভের আশায় তারাবীহর ছালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২০০৯)। পরবর্তীতে এর কাযা আদায় করতে পারে।

প্রশ্ন (৩৪): তারাবীহর হাদিয়া বলে টাকা উঠিয়ে অল্প কিছু টাকা ইমামকে দিয়ে বাকি টাকা মসজিদ ফান্ডে রাখার বিধান কী?

-মিকাইল হোসেন
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর: ইমামকে বেতন দেওয়ার জন্য যদি ইমামের সাথে চুক্তি হয়ে থাকে, তাহলে চুক্তিকৃত টাকা ইমামকে দিতে হবে। আর বাকি টাকা মসজিদের কাজে লাগাবে। বুরায়দা রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূত্রে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'আমরা কাউকে কোনো পদে নিযুক্ত করলে তার রিযিকের ব্যবস্থাও আমরা করি। পরে সে অতিরিক্ত কিছু নিলে তবে তা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য হবে' (আবূ দাঊদ, হা/২৯৪৩)।

প্রশ্ন (৩৫): একজন পুরুষ মানুষ কি শুধু মহিলাদের তারাবীহ পড়াতে পারে?

-মিরাজ ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর: মহিলারা মসজিদেই পুরুষের ইমামতিতে ছালাত আদায় করতে যাবে। অন্যথায় কোনো মহিলা ইমাম দিয়ে বাড়িতে ছালাত আদায় করবে। কোনো একজন পুরুষ ইমাম দিয়ে বাড়িতে ছালাত আদায় করবে না। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, নিশ্চয় আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা নফল ছালাতে মহিলাদের ইমামতি করতেন। তাদের সাথে কাতারে দাঁড়াতেন (মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৫২৩২)।

প্রশ্ন (৩৬): বিতর ছালাত আদায় করলে কি তাহাজ্জুদ বা তারাবীহর ছালাত আদায় করা যাবে? নাকি আগে তাহাজ্জুদই পড়তে হবে?

-সিফাত
খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর: বিতর ছালাত আদায় করলেও তাহাজ্জুদ পড়া যাবে। উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বিতর ছালাত আদায়ের পরও দুই রাকআত ছালাত পড়তেন

(তিরমিযী, হা/৪৭১)। অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যায়, বিতরের পরেও তাহাজ্জুদ পড়া যায়। তবে পরে আর বিতর পড়তে হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘এক রাতে দুই বিতর নেই’ (তিরমিযী, হা/৪৭০; আবূ দাঊদ, হা/১৪৩৯)।

ই‘তিকাফ

প্রশ্ন (৩৭): রামাযানকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য পুরো রামাযান ই‘তিকাফ করা যাবে কি?

-রাগীব আলী
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

উত্তর: করা যাবে না। রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতে হবে। নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ রামাযানের শেষ দশক ই‘তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীগণও (সে দিনগুলোতে) ই‘তিকাফ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২০২৬)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করো’ (ছহীহ বুখারী, হা/২০১৭)। তবে বিশদিনও করতে পারে। যে বছর রাসূল ﷺ ইন্তিকাল করেন সে বছর তিনি বিশ দিনের ই‘তিকাফ করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২০৪৪)।

প্রশ্ন (৩৮): ‘যে ব্যক্তি রামাযানের শেষ দশ দিন ই‘তিকাফ করবে, তাকে দুটি হজ্জ ও দুটি উমরার ছওয়াব প্রদান করা হবে’- মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মো. রোকনুজ্জামান
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর: এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল। হাদীছটি এসেছে যঈফুল জামেউছ ছগীর, হা/৫৪৫১; শুআবুল ঈমান, হা/৩৬৮০; যঈফূত তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৬৬১।

প্রশ্ন (৩৯): মহিলারা কি মসজিদে ই‘তিকাফ করতে পারে? মহিলা পুরুষ একসাথে সম্মিলিতভাবে ‘লায়লাতুল কদর’ আদায় করতে পারে কি?

-আনযারুল ইসলাম
উত্তর দিনাজপুর, ভারত।

উত্তর: মহিলাদের জন্য যদি মসজিদে পূর্ণ পর্দা সহকারে থাকার আলাদা ব্যবস্থা থাকে এবং নিরাপদ হয়, তাহলে মহিলারা মসজিদে ই‘তিকাফ করতে পারে। নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রামাযানের শেষ দশক ই‘তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীগণও (সে দিনগুলোতে) ই‘তিকাফ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২০২৬)। লায়লাতুল কদরে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় ইবাদত করবে; একসাথে মিলিত হয়ে ইবাদত করবে না। উল্লেখ্য, তাদের বাড়িতে ই‘তিকাফ করা বৈধ নয় (আল-বাকারা, ২/১৮৭)।

প্রশ্ন (৪০): আমার এলাকায় এমন একটা প্রচলন আছে যে, ই‘তিকাফের জন্য এলাকার মধ্যে থেকে একজনকে ই‘তিকাফে বসানো হয় এবং বলা হয়, এলাকার মধ্যে কেউ একজন ই‘তিকাফে না বসলে সবাই গুনাহগার হবে, যদি বসে তাহলে সবাই ছওয়াব পাবে। আমার প্রশ্ন হলো এটা কি রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত?

-আলী বিশ্বাস
শশীভূষন, ভোলা।

উত্তর: ই‘তিকাফ মূলত রামাযানে বেশি নেকী অর্জনের এক বিশেষ পদ্ধতি। এলাকার মধ্যে কেউ একজন ই‘তিকাফে না বসলে সবাই গুনাগার হবে- এমন কথা কুরআন-হাদীছে পাওয়া যায় না। বরং রাসূল ﷺ রামাযানে একবার ই‘তিকাফ করেননি। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) তাঁর কাছে ই‘তিকাফ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। এরপর হাফছা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তা দেখে যায়নাব বিনতু জাহশ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) নিজের জন্য তাঁবু লাগানোর নির্দেশ দিলে তা পালন করা হলো। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের ছালাত আদায় করে নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে কয়েকটি তাঁবু দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, ‘এ কী ব্যাপার?’ লোকেরা বলল, আয়েশা, হাফছা ও যায়নাব (রা.)-এর তাঁবু। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ‘তারা কি নেকী পেতে চায়? আমি আর ই‘তিকাফ করব না’। এরপর তিনি ফিরে আসলেন। পরে ছওম শেষ করে শাওয়াল মাসের দশ দিন ই‘তিকাফ করেন (ছহীহ বুখারী, হা/২০৪৫)। এতে প্রমাণ হয় যে, মহল্লার কাউকে ই‘তিকাফ করতে হবে কথাটি মিথ্যা। বাহির থেকে লোক ভাড়া করে ই‘তিকাফ করানো পাপের কাজ।

যাকাত-ফিতরা

প্রশ্ন (৪১): একজনের ফিতরা একের অধিক ব্যক্তিকে কি দেওয়া যাবে নাকি একজন ব্যক্তিকে দিতে হবে?

-জাহাঙ্গীর আলম
শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর: একজনের ফিতরা যেমন এক ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে তেমনি একাধিক ব্যক্তিকেও দেওয়া যাবে, একজন ব্যক্তিকেই দিতে হবে বলে শরীআতের মধ্যে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। এ ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাদাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন, অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রামাযানের) ছওমকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য' (আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯)। উক্ত হাদীছে ফিতরাকে মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থা বলা হয়েছে, কতজনকে দিতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং সময়সাপেক্ষে একজনকেও দেওয়া যাবে এবং একাধিক ব্যক্তিকেও দেওয়া যাবে।

প্রশ্ন (৪২): ফিতরা কী দিয়ে আদায় করতে হবে? কতটুকু দিতে হবে? আমাদের দেশে অনেক জায়গায় মাথাপিছু ফিতরা ৭০ টাকা আদায় করা হয়। এভাবে আদায় করলে ফিতরা আদায় হবে কি?

-সুমাইয়া
টঙ্গী, ঢাকা।

উত্তর: টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় হবে না। দেশের প্রধান খাদ্য থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ঈদের দিন এক সা' পরিমাণ খাদ্য ছাদাকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় করতাম। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর (ছহীহ বুখারী, হা/১৫১০)। আর টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা যাবে না। কেননা (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মুদ্রার প্রচলন ছিল। তবুও তিনি ফিতরা হিসেবে মুদ্রা প্রদানের কথা বলেননি এবং ছাহাবী, তাবেঈ থেকে টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে (জীবিত) ছিলেন, তখন আমরা ছাদাকায়ে ফিতর আদায় করতাম, প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে এক সা' পরিমাণ খাদ্য (খাদ্যশস্য) বা এক সা' পরিমাণ পনির বা এক সা' বার্লি বা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ কিসমিস। আমরা এই হিসেবে ছাদাকায়ে ফিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং অবশেষে মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ পূর্বক ভাষণ দেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সিরিয়া থেকে আগত দুই মুদ গম এক সা' খেজুরের সমপরিমাণ। তখন লোকেরা তাই গ্রহণ করেন। কিন্তু আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি যতদিন জীবিত আছি, ছাদাকায়ে ফিতর এক সা' হিসেবেই প্রদান করতে থাকব (সুনান কুবরা, বায়হাকী, হা/৭৭৭৬; আবূ দাঊদ, হা/১৬১৬)। মুসলিমের বর্ণনায় আছে, আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বিরোধিতা করলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময় যেভাবে এক সা' খেজুর বা কিসমিস বা যব বা পনির দিতাম এখনো আমি সে পরিমাণেই দিব (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৭৭)। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর নিকটে রামাযানের ফিতরা সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, আমি শুধু তাই বের করব যা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বের করতাম। তা হলো এক সা' খেজুর বা গম বা যব অথবা পনির। এক লোক বলল, দুই মুদ গম (বের করলে ফিতরা আদায় হবে না)? তিনি বললেন, এটা মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর পরিমাণ। আমি তা গ্রহণ করব না আর এর প্রতি আমলও করব না (সুনান কুবরা, বায়হাকী, হা/৭৭৭৮)।

প্রশ্ন (৪৩): আমার কাছে ১ ভরি স্বর্ণ এবং ৪০-৫০ হাজার টাকা আছে। যার বর্তমান বাজার মূল্যে মোট সম্পদের পরিমাণ হয় ১ লক্ষ ৫২-৬২ হাজার টাকার মতো। আর ৫২.৫ ভরি রূপার বর্তমান বাজার মূল্য ১ লক্ষ ১০ হাজার ২৫০ টাকা। এখন আমার প্রশ্ন হলো, স্বর্ণের উপর রূপার মূল্যের ভিত্তিতে হিসাব করে যাকাত দেওয়া যাবে কি?

-মো. বদরুল ইসলাম
চড়পারা চিতলমারী, বাগেরহাট, খুলনা।

উত্তর: স্বর্ণসহ সমুদয় সম্পত্তি থেকেই রৌপ্যের মূল্যের ভিত্তিতে হিসাব করে যাকাত বের করা যাবে। মানুষের জমাকৃত টাকা যখন স্বর্ণের নিসাব সমপরিমাণ হবে এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হবে, তখন হিসাব করে নগদ টাকা শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে। অথবা সাড়ে ৫২ ভরি রূপার সমমূল্যের হবে এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হবে, তখন হিসাব করে নগদ টাকা শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে। রূপা যখন সাড়ে ৫২ ভরি হবে, তখন তখন বিক্রয়মূল্য হিসাব করে শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য, স্বর্ণ যখন সাড়ে ৭ ভরি হবে, তখন বিক্রয়মূল্য হিসাব করে শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমার কাছে

দুইশ দিরহাম থাকলে এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে পাঁচ দিরহাম (যাকাত) দিবে। স্বর্ণের ক্ষেত্রে বিশ দীনারের কমে যাকাত নেই। বিশ দীনারের পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে অর্ধ-দীনার যাকাত দিতে হবে। এরপর যা বাড়বে তাতে উপরিউক্ত হিসেবে যাকাত দিতে হবে (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)।

ঈদ

প্রশ্ন (৪৪): আমাদের গ্রামে ঈদের ছালাত ৬ তাকবীরে হয় আর পাশের গ্রামে ১২ তাকবীরে হয়। সুন্নাতের অনুসরণের জন্য পাশের গ্রামে যাওয়ায় অনেকে অনেক কথা বলে। সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর: এমতাবস্থায় যেখানে সুন্নাতের আমল হয় সেখানেই ছালাত আদায় করা উচিত। কেননা ১২ তাকবীরের ব্যাপারে রাসূল ﷺ থেকে অসংখ্য ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের প্রমাণে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'ঈদুল ফিতরের প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর এবং উভয় রাকআতে তাকবীরের পরেই কিরাআত পড়তে হয় (আবূ দাঊদ, হা/১১৫১)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাতে রুকূর তাকবীর ব্যতীত সাত ও পাঁচ তাকবীর দিতেন (ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০; আবূ দাঊদ, হা/১১৪৯)।

প্রশ্ন (৪৫): ঈদের ছালাত কি একাধিকবার আদায় করা যাবে বা কোনো ইমাম আদায় করাতে পারবে?

-রাইহান মিঠু

ফুলতলা, পঞ্চগড়।

উত্তর: একই ঈদের মাঠে একাধিকবার ঈদের ছালাত আদায় করা যাবে না। কেননা এর কোনো প্রমাণ কুরআন হাদীছে নেই। বরং তা ছহীহ হাদীছের বিরোধী। ছহীহ হাদীছে সূর্য উঠার পরপরই ঈদের ছালাত আদায় করার বিষয়টি বুঝা যায়। আর এক মাঠে একাধিকবার জামাআত হলে সময় ঠিক থাকে না। এক্ষেত্রে এলাকাবাসীর উচিত, ঈদগাহ মাঠ বড় করা নাহলে ভাগ করা। আর কোনো ইমাম যদি এক জায়গায় ছালাত পড়ায়, তারপর অন্য জায়গায় ইমাম পাওয়া না যায়; তাহলে সেই ইমাম সেখানে ইমামতি করতে পারে। মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে এশার ছালাত পড়তেন এবং নিজ সম্প্রদায়ে গিয়ে আবার তাদের ইমামতি করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭১১; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৬৫)।

প্রশ্ন (৪৬): আমি এক হিন্দু লোকের সাথে কাজ করি। এখন ঈদের সময় সেই হিন্দু লোকের কাছ থেকে কি ঈদের বোনাস চাওয়া যাবে বা দিলে গ্রহণ করা যাবে?

-ছিয়াম শিকদার

চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তর: বিধর্মীদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা যায়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্ত্রী সারাকে নিয়ে হিজরতকালে এমন এক জনপদে উপস্থিত হলেন, যেখানে ছিল এক বাদশাহ অথবা রাবী বলেন, প্রতাপশালী শাসক। সে বলল, সারার কাছে উপহারস্বরূপ হাজেরাকে দিয়ে দাও। এছাড়া নবী ﷺ-কে বিষ মিশানো বকরীর মাংস হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। আবূ হুমাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আয়িলার শাসক নবী ﷺ-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন, প্রতিদানে তিনি তাকে একটি চাদর দিয়েছিলেন আর সেখানকার শাসক হিসাবে তাকে নিয়োগপত্র লিখে দিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী অধ্যায়ের আলোচনা, হা/২৬১৫)। সুতরাং হিন্দু মালিকের কাছে চাওয়া বা তিনি কিছু দিলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কোনো মুসলিম ব্যক্তি হিন্দু ব্যক্তির মালিক হলে তাদের উৎসব উপলক্ষে কিছু দিতে পারবে না।

প্রশ্ন (৪৭): আমাদের এলাকায় ঈদের মাঠে মহিলাদের ছালাতের কোনো ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি আমার মা আমাদের নিজ বাড়িতে এলাকার মহিলাদের নিয়ে জামাআতবদ্ধভাবে ঈদের ছালাত আদায় করে এবং আমার মা হাদীছের বই পড়ে খুৎবা প্রদান করেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত বিষয়টা কি শরীআত অনুযায়ী ঠিক আছে?

-মেহেদী হাসান

শিবনাদমদমা, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর: এ নিয়ম শরীআতসম্মত নয়, বরং তা বিদআত। মহিলারা ঈদের ময়দানে গিয়ে ঈদের ছালাত গিয়ে আদায় করবে (ছহীহ বুখারী হা/৩৫১)। ব্যবস্থা না থাকলে ব্যবস্থা করতে

হবে। কেননা রাসূল ﷺ খুব গুরুত্ব দিয়ে মহিলাদের ঈদের মাঠে নিয়ে যেতে বলেছেন। নবী ﷺ ঈদের দিনে ঋতুমতী এবং পর্দানশীন নারীদের বের করে আনার আদেশ দিলেন, যাতে তারা মুসলিমদের জামাআত ও দু'আয় অংশগ্রহণ করতে পারে। অবশ্য ঋতুমতী নারীগণ ছালাতের জায়গা হতে দূরে অবস্থান করবে। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কারো ওড়না নেই। তিনি বললেন, 'তার সাথীর উচিত তাকে নিজের ওড়না পরিয়ে দেওয়া' (ছহীহ বুখারী হা/৩৫১)। যদি এলাকায় মহিলাদের ঈদগাহে ছালাতের ব্যবস্থা না থাকে, তবুও আলাদা করে মেয়েদের ঈদের জামাআত করা যাবে না। মেয়েরা একাই বাড়িতে ঈদের ছালাত পড়ে নিতে পারে।

প্রশ্ন (৪৮): ঈদের দিনের করণীয় কী? ঈদের ময়দানে ছালাতের পূর্বে মছল্লীদের নিকট হতে দান গ্রহণ করা যাবে কি?

-মাসরুর আলম
মালদা, ভারত।

উত্তর: ঈদের দিনের আমলগুলো উল্লেখ করা হলো- গোসল করা, পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা। ঈদুল ফিতরের দিন বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে ঈদের ছালাতে যাওয়া আর ঈদুল আযহার দিন না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত। ঈদগাহে একপথে যাওয়া এবং ভিন্ন পথ দিয়ে হেঁটে আসা সুন্নাত (ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৩-৯৮৬; মুআত্বা, হা/৪২৮)। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে বের হওয়ার পর থেকে ছালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা। আর ঈদুল আযহার ৯ যিলহজ্জ আরাফার দিন ফজর হতে ১৩ যিলহজ্জ আছর ছালাতের পর পর্যন্ত নারী-পুরুষের তাকবীর পাঠ করা। তবে নারীরা নিম্নস্বরে তাকবীর পাঠ করবে (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ২/৭১-৭২; ইরওয়া, ৩/১২১)। এছাড়াও ছাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা আদায় করা। আর ঈদের ময়দানে ছালাতের পূর্বে মুছল্লীদের নিকট হতে দান গ্রহণ করা শরীআতসম্মত নয়, বরং তা ছালাতের পরে হতে হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৫)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৯): শবেবরাতে অনেক জায়গায় অনেক আয়োজন করা হয় এবং মসজিদে ইবাদত করা হয়। এব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

-নয়ন
ঢাকা।

উত্তর: একদল মানুষ শা'বান মাসের ১৫তম রাতকে বিশেষ মর্যাদায় পালন করে, যা বিদআত। শা'বান মাসের কোনো রাতকে সৌভাগ্যের রাত বলে ঘোষণা করা হয়নি; ইসলামে সৌভাগ্যের রাত হলো লায়লাতুল ক্বদর। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি এটি (আল-কুরআন) এক বরকত ও কল্যাণময় রাতে নাযিল করেছি' (আদ-দুখান, ৪৪/৩)। উক্ত আয়াতে 'লায়লাতুম মুবারাকা' হলো 'লায়লাতুল ক্বদর'। সুতরাং শবেবরাতকে কেন্দ্র করে কোনো আয়োজন করা তথা হালুয়া-রুটি ও গোশত পাকানো এবং তা পাড়া-প্রতিবেশীদের মাঝে বিলানো, আলোকসজ্জা এবং আনন্দ উৎসবে পটকা ফুটানো বা খাছ কোনো ইবাদত বিদআত। এছাড়া এ রাতে আলাদাভাবে ছালাত আদায় করা হয়। প্রথা অনুযায়ী এ ছালাতের পদ্ধতি হলো প্রতি রাকআতে সূরা আল-ফাতেহার পর সূরা আল-ইখলাছ ১০ বার করে পড়ে মোট ১০০ রাকআত ছালাত পড়া হয়, যাতে করে সূরা আল-ইখলাছ ১০০০ বার পড়া হয়। মিশকাতের ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেন, জেনে রাখুন, ইমাম সুয়ূত্বী রহিমাহুল্লাহ (৮৪৯-৯১১ হি.) তার কিতাবে দায়লামী ও অন্যদের আনীত হাদীছসমূহ যেখানে মধ্য শা'বানে প্রতি রাকআতে ১০ বার করে সূরা আল-ইখলাছসহ ১০০ রাকআত ছালাতের যে অগণিত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তা সবই মাওযূ' বা জাল (মিরক্বাত, দিল্লী ছাপা: তাবি, ৩/১৯৭)। তাই সৌভাগ্য রজনী অথবা মুক্তি রজনী মনে করে বিভিন্ন প্রকার আমল ও ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা, এটা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী। এটাই ধর্মে বাড়াবাড়ি। যা ধর্মে নেই, তা উদযাপন করা ও প্রচলন করার নাম বিদআত।

প্রশ্ন (৫০): বাসায় খাঁচার মধ্যে পাখি পোষা যাবে কি?

-নাজমুল হক
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

উত্তর: এমন অপ্রয়োজনীয় শখ করার প্রয়োজন নেই। এতে তাদের স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্ত হয়। তবে সাংসারিক প্রয়োজনে গবাদিপশুর ন্যায় পালন করতে পারে। সেক্ষেত্রে ঠিকমত খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কাজ পরিহার করা' (ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৭৬)।

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٩ ،شعبان و رمضان و شوال ١٤٤٦هـ/ مارس ٢٠٢٥م العدد:٥، الجزء : ١٠١
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বরসমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য
মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ | নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহমুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২

মাসিক আল-ইতিছাম-এর বর্ষভিত্তিক বোর্ড বাইন্ডিং সংগ্রহ করুন

প্রতি বর্ষ
বোর্ড বাইন্ডিং-এর মূল্য
৪৬০ টাকা

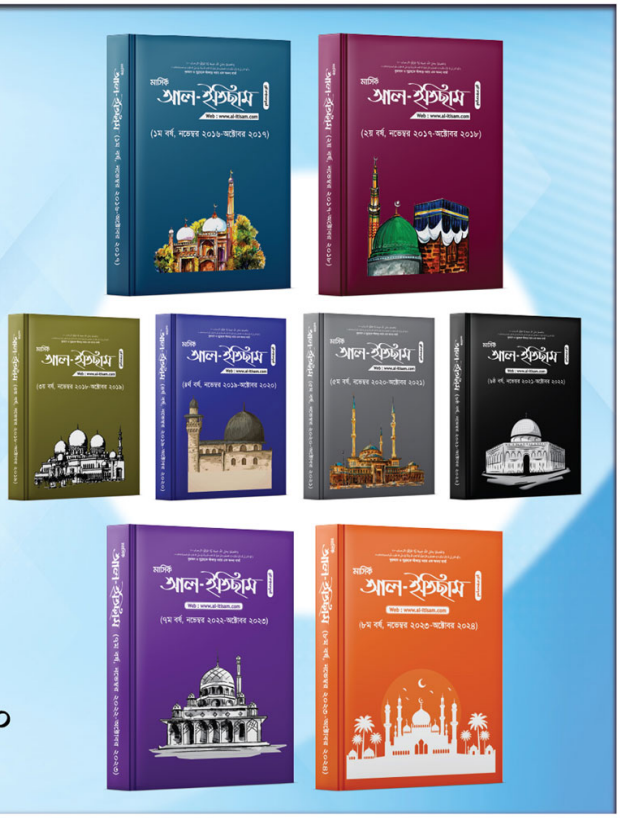

বোর্ড বাইন্ডিং পেতে যোগাযোগ করুন
০১৭৫০-১২৪৪৯০ ০১৪০৭-০২১৮৪০

alitisam2016 al-itisam.com

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচি

হিজরী: ১৪৪৬, ঈসায়ী: ২০২৫, বঙ্গীয়: ১৪৩১

ঢাকার জন্য

তারিখ			বার	সাহারীর শেষ সময় ঘন্টা-মিনিট	ইফতারের সময় ঘন্টা-মিনিট
হিজরী	ঈসায়ী	বঙ্গাব্দ			
১ রামাযান	২ মার্চ	১৭ ফাল্গুন	রবিবার	০৫:০৪	০৬:০২
২ রামাযান	৩ মার্চ	১৮ ফাল্গুন	সোমবার	০৫:০৩	০৬:০৩
৩ রামাযান	৪ মার্চ	১৯ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:০২	০৬:০৩
৪ রামাযান	৫ মার্চ	২০ ফাল্গুন	বুধবার	০৫:০১	০৬:০৩
৫ রামাযান	৬ মার্চ	২১ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	০৫:০০	০৬:০৪
৬ রামাযান	৭ মার্চ	২২ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৪:৫৯	০৬:০৪
৭ রামাযান	৮ মার্চ	২৩ ফাল্গুন	শনিবার	০৪:৫৯	০৬:০৫
৮ রামাযান	৯ মার্চ	২৪ ফাল্গুন	রবিবার	০৪:৫৮	০৬:০৫
৯ রামাযান	১০ মার্চ	২৫ ফাল্গুন	সোমবার	০৪:৫৭	০৬:০৬
১০ রামাযান	১১ মার্চ	২৬ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৪:৫৬	০৬:০৬
১১ রামাযান	১২ মার্চ	২৭ ফাল্গুন	বুধবার	০৪:৫৫	০৬:০৭
১২ রামাযান	১৩ মার্চ	২৮ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	০৪:৫৪	০৬:০৭
১৩ রামাযান	১৪ মার্চ	২৯ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৪:৫৩	০৬:০৮
১৪ রামাযান	১৫ মার্চ	০১ চৈত্র	শনিবার	০৪:৫২	০৬:০৮
১৫ রামাযান	১৬ মার্চ	০২ চৈত্র	রবিবার	০৪:৫১	০৬:০৮
১৬ রামাযান	১৭ মার্চ	০৩ চৈত্র	সোমবার	০৪:৫০	০৬:০৯
১৭ রামাযান	১৮ মার্চ	০৪ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪:৪৯	০৬:০৯
১৮ রামাযান	১৯ মার্চ	০৫ চৈত্র	বুধবার	০৪:৪৮	০৬:০৯
১৯ রামাযান	২০ মার্চ	০৬ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	০৪:৪৭	০৬:১০
২০ রামাযান	২১ মার্চ	০৭ চৈত্র	শুক্রবার	০৪:৪৬	০৬:১০
২১ রামাযান	২২ মার্চ	০৮ চৈত্র	শনিবার	০৪:৪৫	০৬:১১
২২ রামাযান	২৩ মার্চ	০৯ চৈত্র	রবিবার	০৪:৪৪	০৬:১১
২৩ রামাযান	২৪ মার্চ	১০ চৈত্র	সোমবার	০৪:৪২	০৬:১১
২৪ রামাযান	২৫ মার্চ	১১ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪:৪১	০৬:১২
২৫ রামাযান	২৬ মার্চ	১২ চৈত্র	বুধবার	০৪:৪০	০৬:১২
২৬ রামাযান	২৭ মার্চ	১৩ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	০৪:৩৯	০৬:১৩
২৭ রামাযান	২৮ মার্চ	১৪ চৈত্র	শুক্রবার	০৪:৩৮	০৬:১৩
২৮ রামাযান	২৯ মার্চ	১৫ চৈত্র	শনিবার	০৪:৩৭	০৬:১৩
২৯ রামাযান	৩০ মার্চ	১৬ চৈত্র	রবিবার	০৪:৩৬	০৬:১৪
৩০ রামাযান	৩১ মার্চ	১৭ চৈত্র	সোমবার	০৫:৩৫	০৬:১৪

বি.দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রদর্শনের উপর নির্ভরশীল

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া (www.bmd.gov.bd) | মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) | গণনা পদ্ধতি: University of Islamic Sciences,Karachi.

বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য জেলাসমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণে অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচি দেখানো হয়েছে।

জেলাভিত্তিক সময়সূচি [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
নরসিংদী	-২	-১	-১	-১
গাজীপুর	০	০	০	০
শরিয়তপুর	০	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	-২	-১	-২	-১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	-১	০	-১	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪	+৪
মাদারীপুর	+১	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+২

চট্টগাম বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৪	-৪	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৭	-৭	-৭	-৭
নোয়াখালী	-৩	-২	-৩	-৩
চাঁদপুর	-১	-১	-১	-১
লক্ষ্মীপুর	-১	-১	-২	-২
চট্টগ্রাম	-৫	-৫	-৬	-৬
কক্সবাজার	-৫	-৫	-৬	-৭
খাগড়াছড়ি	-৬	-৬	-৭	-৭
বান্দরবান	-৭	-৭	-৭	-৮

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
সিলেট	-৭	-৬	-৬	-৬
মৌলভীবাজার	-৬	-৬	-৬	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৪	-৪	-৪
সুনামগঞ্জ	-৫	-৪	-৪	-৩

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
শেরপুর	+১	+১	+১	+২
ময়মনসিংহ	-১	-১	০	০
জামালপুর	+১	+১	+২	+২
নেত্রকোণা	-২	-১	-১	-১

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৩	+৩
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৩	+৪	+৪	+৪
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭
নাটোর	+৫	+৫	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৫	+৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৮	+৮	+৯
নওগাঁ	+৫	+৫	+৬	+৬

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
যশোর	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৬	+৬	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+৪	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৪	+৩	+৩
বাগেরহাট	+৩	+৩	+২	+২
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
পঞ্চগড়	+৬	+৬	+৭	+৮
দিনাজপুর	+৬	+৬	+৭	+৭
লালমনিরহাট	+৩	+৩	+৪	+৫
নীলফামারী	+৫	+৫	+৬	+৭
গাইবান্ধা	+২	+৩	+৩	+৪
ঠাকুরগাঁও	+৬	+৭	+৭	+৮
রংপুর	+৩	+৪	+৪	+৫
কুড়িগ্রাম	+২	+২	+৩	+৪

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
ঝালকাঠি	+১	+১	+১	০
পটুয়াখালী	+১	+১	০	০
পিরোজপুর	+২	+২	+২	+১
বরিশাল	+১	০	০	০
ভোলা	-১	০	-১	-১
বরগুনা	+২	+২	+১	০

সাহল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে; ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে'

(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮)।